॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

:: সমর সেন ::

148827 1 OCT 2002

॥ এক ॥

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর সমর সেন কোলকাতায় জন্মান। তাঁর পিতা ছিলেন অরুণচন্দ্র সেন, পিতামহ দীনেশচন্দ্র সেন। ১৯৩২ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩৬ সালে ইংরাজী অনার্স নিয়ে বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯৩৮ সালে এম.এতেও তিনি একই স্থানে লাভ করেন।

১৯৩৩ সাল থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন— প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকায় এবং তারপর কবিতা, পরিচয় ইত্যাদি পত্রিকায়। ১৯৩৭ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা' প্রকাশিত হয়।

ছাত্র জীবন থেকেই সমর সেন রাজনীতি সচেতন ছিলেন। তাঁদের বেহালার বাড়ীতে সেই সময়ে কমুনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেকের যাওয়া আসা চলত। তিনি তাঁর প্রথম কবিতার বইটিও উৎসর্গ করেছেন 'মোজাফর আহ্মেদকে'।

রাজনীতি সচেতন হলেও সক্রিয় আন্দোলনের সঙ্গে তিনি কখনোই যুক্ত হন নি। তাছাড়া অন্ধ মোহও তাঁর কোন দল বা ব্যক্তির প্রতি ছিল না। সমালোচনায় তিনি বারবার ই মোহমুক্ত ছিলেন।

সমর সেন কোন কিছুর জন্যেই আপোষ রফা খুব একটা, অথবা বলা যায় প্রায় করেন নি। তাই দেখা যায় বার বার তাঁর পেশার পরিবর্তন করতে হয়েছে।

১৯৪০ সালে কাঁথির প্রভাতকুমার কলেজে দু মাস কাজ করেছেন।

১৯৪০-এর অক্টোবর-এ দিল্লীর কমার্সিয়ান কলেজে কাজ নিয়েছেন। সেখানে ১৯৪৪ পর্যন্ত অধ্যাপনা করে ছেড়ে দিয়েছেন। সে বছরই বিজ্ঞাপন সংস্থায় দিন কয়েক কাজ করে, দিল্লীর অল ইন্ডিয়া রেডিওর সংবাদ বিভাগে কাজ নেন।

১৯৪১- এ The Statesman - পত্রিকার সাব এডিটর হয়ে আসেন।

১৯৫৭-য় মস্কো যান অনুবাদকের চাকরি নিয়ে।

১৯৬১-তে দেশে ফিরে বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ নেন।

১৯৬২-তে Hindusthan Standard -এ যুক্ত সম্পাদক হন।

১৯৬৪ - তে Hindusthan Standard ত্যাগ করে হুমায়ুন কবিরের অনুরোধ Now পত্রিকার সম্পাদক হন।

১৯৬৮ -এ Now এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে Frontier পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৮৭-র ২৩শে আগস্ট পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সাথেই যুক্ত ছিলেন।

১৯৮৭-এ ২৩শে আগস্ট তিনি মারা যান।

সমর সেনের কাব্য গ্রন্থের একটি তালিকা দেওয়া হল।

১.	কয়েকটি কবিতা	প্রকাশকাল	১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ
২.	গ্রহণ	,,	১৯৪০ ,,
৩.	নানা কথা	,,,	১৯৪১ ,,
৪.	খোলা চিঠি	,,	১৯৪৩ ,,
৫.	তিনপুরুষ	,,	১৯৪৪ ,,

॥ দুই ॥

সমর সেন যে পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন; 'কয়েকটি কবিতা' তার মধ্যে প্রথম। অবশ্য পরবর্তী সময়ে যখন তিনি আলাদা কাব্যগ্রন্থ-এর বদলে একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন 'সমর সেনের কবিতা' নাম দিয়ে, কাব্যগ্রন্থগুলির আলাদা অস্তিত্বকে দিয়ে সেগুলিকে রচনাকালের সীমায় চিহ্নিত করেছিলেন— সেই হিসাবে ১৯৩৪ - ৩৭ এই সময়ে কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল— প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৭ সালে। এই কাব্য গ্রন্থে মোট ঊনপঞ্চাশটি কবিতা রয়েছে— কবিতাগুলির অধিকাংশই সাময়িক পত্রিকায়-বিশেষত: কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত।

কয়েকটি কবিতা সমর সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলেও প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে এক পরিণত কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বসু তাঁ সম্পর্কে বলেছিলেন —

> They are little lyrics, pale, frail and wistful, flowers of youth, or buds of adolescence but not raw fruits of immaturity. ১

শুধুমাত্র পরিণত কবিমন বললেই যথেষ্ট হবে না তিনি তাঁর প্রথম বইটি থেকেই পরবর্তী কাব্যজীবন কেমন হবে তাও জানিয়েছেন। এখান থেকেই তিনি যে নাগরিক কবি সেই ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি কলকাতা শহরের এমন সুস্পষ্ট ছবি এঁকেছেন যা দেখে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে এই শহরের সাথে তিনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কয়েকটি কবিতার সমালোচনা লিখতে গিয়ে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাথে সমর সেনের নাগরিক কবি মনটির কথাও বিশেষ করে বলেছেন, ——

> Samar Sen's contents are urban; and his mood finde siecle. The city has destroyed all that has been taught to be beautiful. It is an inchoate mass reacking with patchonli and petrol. It has ignored humanity and generated snobbishness. Almost a cancer, a monster a python, a passionate tiger, Nevertheless it is a fact, which exacts no tribute of tears from the poet. The fact of ugliness the reality of the sordiotnes is sotypically up-to-date. ২

এই কবি শহরের সাথে, কোলকাতা শহরের সাথে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। তাঁর জন্ম, শিক্ষা রুচিবোধ এই কোলকাতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত জীবনচর্চায় পল্লী জীবন কোন ছাপ ফেলে নি। ফলে কাব্য-চর্চার ক্ষেত্রেও গ্রাম বিষয় হিসাবে আসেনি। নগর জীবনের বাইরের কথা তিনি বলেছেন কখনো কিন্তু সেও গ্রাম বাংলা নয়। সাঁওতাল পরগণা বা কাছাকাছি অন্য স্থান। প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা যেখানে লিখেছেন সেখানেও পাই শহরের এবং লাল মাটি আর দেবদারু শোভিত বনের ছবি।

আধুনিক কবিদের সাধারণ লক্ষণ হতাশা, ক্লান্তি, বিষাদ। নঙর্থক এক জীবনভাবনা তাঁদের কবিতা রচনার উৎস হয়ে দাঁড়ায় কখনো। রবীন্দ্রনাথের থেকে এখানেই তাঁদের ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথের কবিতায়-গানে সুন্দরের অন্বেষণ আছে আর তাতে দুঃখ ও পরম বস্তু বলে তিনি মনে করেছেন। আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার বিপরীতে বাস করেন। সমর সেন অথবা তাঁর মত কোন

কোন কবি এই জীবনদর্শনকে ভাঙ্গার চেষ্টাও করেছেন। দুঃখকে দুঃখ বলেই জেনেছেন কিন্তু সেই দুঃখ থেকে উত্তরণের কোন পথ তাঁরা পান নি।

হতাশা, ক্লান্তি, বিষাদ-এর উৎস নগরজীবন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পূর্বক্ষণের পৃথিবীতে এই হতাশা স্বাভাবিক ছিল। আর যুদ্ধের প্রভাব যেহেতু নগরজীবনে বেশী পড়ে তাই আধুনিক নাগরিক কবিদের মধ্যেই তা বেশী দেখা যায়।

সমর সেনের কবিতায় আমরা এই হতাশা, গ্লানি আর ক্লান্তির চিত্র সর্বব্যাপ্ত হতে দেখি। যেখানে তিনি প্রেমের কবিতা লিখেছেন সেখানেও এই হতাশা উঠে এসেছে। প্রকৃতির মধ্যেও তিনি জীবনের গ্লানিকে ফুটে উঠতে দেখেছেন।

কয়েকটি কবিতার 'গোধূলি', 'নিঃশব্দতার ছন্দ' 'চিত্র' 'বিরহ' 'স্মৃতি', 'প্রেম' 'মুক্তি', 'একটি মেয়ে' ইত্যাদি কবিতায় রয়েছে এক হতাশ প্রেমিকের ছবি —'গোধূলি' কবিতায় তিনি গোধূলির নেমে আসা অন্ধকারে পশ্চিমের আকাশকে দেখছেন চাপা রক্তেরঙে, হাওয়ায় ভেসে আসা ফুলের গন্ধ আর কিসের হাহাকার। এই নির্জনতায় তিনি বিরহের পদধ্বনি শুনতে পান।

নির্জন অন্ধকারে
স্পন্দমান মুহূর্তগুলি কী যেন বয়ে আনে
কী যেন প্রতিক্ষণে মনে পড়ে
শুধু যেন শুনি
ক্লান্ত ভাবে শুনি আর শুনি —
সুদূর বিরহের করুণ পদধ্বনি।

এই কবিতার বিরহ সুদূরের জন্য, নিঃশব্দতার ছন্দ কবিতায় তিনি নিঃসঙ্গ,—
তাই বলেছেন ——

কেন তুমি বাইরে যাও শব্দরাতে
আমাকে একলা ফেলে ?
কেন তুমি চেয়ে থাক ভাষাহীন, নিঃশব্দ পাথরের মতো ?

কখনো চকিতে তিনি এই নিঃশব্দতার ছন্দকে অনুভব করেন, বোঝেন এই নিঃশব্দতায় দিনের পরে আসে রাত, পৃথিবীতে আসে সবুজপ্রাণ অথবা বলা যায় এই নিঃশব্দতায় সমস্তই সৃষ্টি হয়।

'একটি রাত্রির সুরেও রয়েছে অন্ধকার, হাহাকার আর নিঃসঙ্গতার কথা-সেই সঙ্গে রয়েছে যান্ত্রিকতার কথাও ——

ঘনায়মান অন্ধকারে
করুণ আর্তনাদে আমাকে সহসা অতিক্রম করন
দীর্ঘ, দ্রুত যান—
বিদ্যুতের মতো :
কঠিন আর ভারি চাকা, আর মুখর
অন্ধকারের মতো সুন্দর,
অন্ধকারের মতো ভারি।

অথবা,

দীর্ঘ লৌহ রেখার সহসা শিহরণ—
আর অস্ফুট, শীর্ণ, বহুদূর, কীসের আর্তনাদ,
কঠোর, কঠিন।

প্রথমে এই যান্ত্রিকতা সুন্দর বলে মনে হলেও ক্রমে তা কঠোর কঠিন হয়ে উঠেছে এটা লক্ষণীয়।

সমর সেনের প্রেমের কবিতায় যে বিরহ আছে তাতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই আছে হাহাকার আর বিষাদ ক্লান্তি। এটিই তাঁর প্রেমের কবিতার বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধদেব বসু অবশ্য কয়েকটি কবিতায় 'একটি স্পর্শকাতর সুন্দর যৌবনকে'[৩] দেখতে পেয়েছেন কিন্তু এই যৌবনের মধ্যে আমরা কোন উন্মাদনা বা পাবার তীব্র আসক্তি পাই না। বরং এতে না পাওয়ার বিষন্নতাই বার বার ফুটে ওঠে। প্রেম তাঁর কাছে 'ভুলে যাওয়া গন্ধের মতো'[৪] চকিতে কখনো মনে পড়ে।

অন্ধকারের স্তব্ধতা ভেঙেছেন বলল —
"জান, কাল রাত্রে মিনির বিয়ে হয়ে গেছে?"
অন্ধকার দিঘিতে সে শব্দ পাথরের মতো।
"ও কিছুই নয়, কদিনই বা মনে থাকবে,
তবে হয়ত কোনো রাত্রে রতিবিহারের সময়
হঠাৎ তোমাকে মনে পড়বে,
আর সেদিন সমস্ত রাত
চোখে আর ঘুম আসবে না।"[৫]

প্রেমের বিষয়ে এই সমর সেনের ভাবনা। প্রেম চিরদিনের স্মৃতি নয়, কিছুদিন পর তা চকিত মুহূর্তে মনে পড়ে,দেহ প্রকৃতির অভ্যাসে। আধুনিক কবিদের কাছে প্রেমের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে গেছে। বিশ্বাসহীন পৃথিবীতে কবিরা প্রেমের বিষয়েও বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। অনুভূতির ক্ষেত্রে এই ছায়া নাগরিক বোধ সঞ্জাত।

এই হতাশা বা অবিশ্বাস ছাড়াও এমন কিছু শব্দ বা উপমা

ব্যবহার করছেন যা উল্লেখযোগ্য ভাবে লক্ষ্যণীয়-গোধূলিতে 'দগ্ধ রজনীগন্ধা' এখানে দগ্ধ শব্দটি বা

১. আমার নিদ্রাহীন অন্ধকারে শুধু যেন শুনি
দুপুরের খর সূর্যে ক্লান্ত মহিষের পদক্ষেপ
ইস্পাতের কঠিন পথে। [৬]

২. বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে
তোমাকে পাবার বাসনা। [৭]

৩. আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে
আজ তোমার আবির্ভাব হলো;
... ...
আমাদের দুর্বল ভীরু অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার। [৮]

মহিষের পদক্ষেপের (শোনা যায় ইস্পাতে পথে) ক্লান্তি বা বাসনাকে বিষাক্ত বলে মনে হওয়া. কখনো বা সুন্দরকে পাবার বাসনা প্রহারের মত তীক্ষ্ণ হওয়া কবির ক্লান্ত, বিষাক্ত মনেরই প্রকাশ। এই অবস্থায় সুন্দরকে পাওয়া যায় না। তাই সেই বাসনা প্রহারের মতো কঠিন হয়ে বাজে!

শুধু প্রেম নয় প্রকৃতি বিষয়ক লেখার মধ্যেও সময় সেন লক্ষণীয় পরিবর্তন এনেছেন। এই প্রকৃতি কখনোই কোন গ্রাম্য নয়। কখনো দিয়েছেন রাতের বর্ণনা, কখনো বা স্থানের বর্ণনা। 'তাঁর কাব্যে রবীন্দ্রনাথ-লালিত ক্লান্ত করুণ বিষাদ শাল মহুয়ার বনে, কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে, চাঁদের পাণ্ডুর আলোয়, পাহাড়ের দূর নীলে, শহরের এলোমেলো গলি'তে, দূর দিগন্তে পায়।' [১]

তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার বিষয়ে এই মন্তব্য করেছেন বিষ্ণু দে। অবশ্য সমর সেনের বিষাদ, ক্লান্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিষাদ ক্লান্তি এক নয়। কিন্তু তা হলেও এইসব কবিতার বিষাদ ক্লান্তি বা পাণ্ডুরতা লক্ষণীয়। গ্রাম বাংলার সজল শ্যামল রূপ তিনি আঁকেন নি। নগরজীবনের বৈশিষ্ট্যই তাঁর কবিতায় রূপ লাভ করেছে। 'একটি রাত্রির সুর,' চারটি কবিতা শীর্ষক কবিতার,—'রাত্রি' 'ঝড়' 'সাড়া,' 'ক্লান্তি,' 'শেষ বসন্ত,' 'মহুয়ার দেশ,' 'শেষরাত্রে' 'ভোরের কলকাতা' 'বসন্ত,' এই সব কবিতায় তিনি কখনো কোনকাতার রূপ, কখনো বা পাইনের বন, দেবদারু গাছের নির্জনতা অথবা মহুয়ার দেশের বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনার মধ্য দিয়েই তাঁর মনের আশা, আকাঙ্খা বা ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে।

'রাত্রি' কবিতায় কবির স্মৃতি ভেসে আসে বর্ণহীন আকাশ থেকে, 'চিত্রা' কবিতায় শূন্য প্রান্তরে এলোমেলো হাওয়া অনামী ফুলের গন্ধ— তবু চিত্রার চোখের ক্লান্তি দূর হয় না। ঝড় কবিতায়ও তিনি জানালার ফাঁক দিয়ে পীড়িত আকাশের আভাস দেখতে পান সেই আকাশে মেঘ জমে শীতের অজগরের মতো।

আকাশে ধোঁয়ার ক্লেশ, চারিদিকে ধোঁয়ার গন্ধ,
আর হাওয়ায় অসংখ্য ধুলোর কণা
জীবন্ত বীজাণুর মতো।
. . . আমার মনে শান্তি নেই।

যদি ঝড় আসে তবে প্রকৃতির সাথে কবির মনও শান্ত হবে। এখানে ধোঁয়ায় ধুলোয় ভরা পৃথিবীতে কবির মন অশান্ত।

'সাড়া' কবিতায় 'অর্দ্ধ রাত্রে' তাঁর অন্তরে উতলা হাওয়ার মত স্মৃতি ভেসে এল —

দিগন্তের কুয়াশায় যেন স্বপ্নের আভাস।
কোথায় কোন পথের দুধারে নেমেছে গভীর অন্ধকার,
হাওয়ায় দেবদারুর স্তব্ধ ঘন সারি উঠছে কেঁপে,
আর ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর একপ্রান্তে —
সহসা এসেছে অরণ্যের হাহাকার
পাষাণের দীর্ঘ রেখায়।

কবির কল্পনায় ভেসে আসে দেবদারু গাছের সারিতে ঘনিয়ে ওঠা অন্ধকার কিন্তু শুধু এইটুকুই দেখে না তাঁর মনশ্চক্ষু — এও দেখে-অরণ্যে হাহাকার উঠেছে আর দেখা যাচ্ছে পাষাণের দীর্ঘ রেখা।

'মহুয়ার দেশ' কবিতায়ও 'ধোঁয়ায় বঙ্কিম নিশ্বাস' যখন 'শীতের দুঃস্বপ্নের মতো' কবির মনে চেপে বসে তখনই তাঁর মনে হয় —

অনেক অনেক দূরে আছে মেঘ মদির মহুয়ার দেশ
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাতের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।

নগরের রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় তাঁর মনে হচ্ছে মহুয়ার দেশের কথা। কামনা করছেন ক্লান্তির উপরে মহুয়া ফুলের গন্ধ নেমে আসুক। লক্ষণীয় তাঁর ক্লান্তির শান্তি-গ্রাম-বাংলার স্নিগ্ধ প্রকৃতি নয়-মহুয়ার দেশ। তাঁর কাছে মহুয়ার দেশ মুক্তির স্বপ্ন। কিন্তু কবি আগ্রাসী নগর প্রকৃতির কথা জানেন-তাও তিনি পাঠককে শুনিয়েছেন।

কবিতার দ্বিতীয় অংশে বলছেন মহুয়া বনের ধারে কয়লাখনির কথা—অবসন্ন মানুষের কথা —

মহুয়াবনের ধারে কয়লার খনির
গভীর, বিশাল শব্দ
আর শিশির ভেজা সবুজ সকালে,
অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক,
ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন।

এইভাবেই মহুয়া বন তাঁর কাছে মুক্তির স্থান সেখানেও নগর সভ্যতা বাহু বিস্তার করেছে।

'বসন্ত' কবিতায়ও পাইন বনের মর্মর ধ্বনিও সন্ধ্যা নামার বর্ণনা যখন দিচ্ছেন তখনই বলছেন 'তারপর রাত্রি ভরে ট্রাফিক পুলিশের নিঃসঙ্গতা'- এখানে নিঃসঙ্গতাকে ট্রাফিক পুলিশের সাথে তুলনা করা লক্ষ্য করার মত।

'বসন্তের গান' কবিতাতেও স্বপ্নে যখন ধূসর পাহাড় দেখেন তখনই শোনেন 'কীসের বিবর্ণ পদক্ষেপ'।

'ভোরের কলকাতা' কবিতায় তিনি কলকাতার ক্লান্ত বিধ্বস্ত ছবি দেখতে পেয়েছেন। কলকাতার ভোরে তিনি কোন মাধুর্য বা সৌন্দর্যকে দেখতে পান নি। দেখেছেন —

রিক্সার উপরে ক্লান্ত চীনে গণিকা যখন চোখ বোজে
সূর্যের রোদ উত্তাপে,

তখন দিন-রাত্রির নিঃশব্দতা
তোমার রক্তে আসে
নীল নদীর মতো।

তিনি দেখতে পান নাগরিক আনন্দের অশ্লীলতা, মানুষের ক্লান্তি। এই ক্লান্তি আর অশ্লীল আনন্দ যেন শহরটিকে গণিকার মত করে তুলেছে।

নগরের রূপ কবির কাছে এই ভাবেই ধরা পড়েছে।

'মেঘদূত,' 'নাগরিক,' 'একটি নিউরিটিক কবিতা,' 'মুক্তি,' 'উর্বশী,' 'ভোরের কলকাতা,' 'নাগরিক,' 'নাগরিক,' 'স্বর্গ হতে বিদায়,' 'পোস্ট গ্রাজুয়েট,' 'একটি বেকার প্রেমিক,' — এই কবিতাগুলিতে শহরের স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে।

'মেঘদূত' নামে তাঁর দুটি কবিতা এই কাব্যগ্রন্থে রয়েছে। প্রথমটি অনুষ্টুপ সংস্করণের নয়ের পাতায় রয়েছে। 'মেঘদূত'- এর সাথে বাঙালী পাঠকের পরিচয় দীর্ঘদিনের। কালিদাসের মেঘদূত কাব্য, রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত নামক কবিতা এবং প্রবন্ধে বাঙালী মানস লালিত। মেঘদূতের সাথে বা বর্ষার নব মেঘের সাথে প্রেম-বিরহ, বেদনা ইত্যাদি বহু ভাব আমাদের মনে জেগে ওঠে। কিন্তু মেঘ তো শুধু বর্ষাকেই আনে না-আনে আরো নানা কিছু। আধুনিক কবি সেই দিকেই আঙুল তুলেছেন। ——

বৃষ্টির আগে ঝড়, বৃষ্টির পরে বন্যা। বর্ষাকালে
অনেকদেশে যখন অজস্র জলে ঘরবাড়ি ভাসবে,
ভাসবে মৃত পশু আর মুখর মানুষ,—

ঝড়ে আর বন্যায় মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হবে, মানুষ অথবা পশু দুইই এই

মেঘের কবলে পড়বে। শুধু তাই নয়' শহরের রাস্তায়' তখন দুর্ভিক্ষের স্বেচ্ছা-সেবকেরা আর্তনাদ করে সাহায্য চাইবে।

আর তারই মধ্যে কিছু মানুষের মধ্যে দেখা যাবে মিলনের বিলাস। মানুষের দুর্দিনে মানুষ বিচলিত হচ্ছে না বলেই কবি এই প্রেমকে বিলাস বলছেন। প্রেমের কোন মহীয়ান মহিমাও তিনি দেখতে পান না, তাই বলেন —

হে ম্লান মেয়ে, প্রেমে কী আনন্দ পাও,
কী আনন্দ পাও সন্তান ধারণে?

এখানে কবি প্রেমকে প্রবৃত্তির তাড়না ছাড়া আর কিছুই ভাবছেন না। প্রেমের মহত্তর কোন দিক থাকলে বর্ষার ঐ বিধ্বস্ত চেহারায় মানুষ আনন্দ পেতে পারে না।

কবিতায় দুর্ভিক্ষের স্বেচ্ছাসেবকেরা 'শহরের রাস্তায়' ঘুরছে। কবি এদের চাঁদা চাইবার ভঙ্গীকেও ব্যঙ্গ করছেন, বলছেন — সদল বলে আর্তনাদ করছে। এখানে শহরের রাস্তা বলে তিনি কবিতাটির প্রেক্ষাপট বোঝাতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় 'মেঘদূত' কবিতায় প্রথম স্তবকে ম্লানে রবী-দ্রনাথের প্রবন্ধের ব্যাখ্যায় ব্যস্ত কবি —'প্রত্যেক দুটি মানুষের মধ্যে যে বিপুল, গভীর বিরহ' তারই ব্যাখ্যা। ছুটির ঘন্টা বেজে গেল। আকাশের মেঘ দেখে কবির মনে জাগল ছেলেবেলায় জেনে ভেজার আনন্দের কথা। সেই আনন্দ এখন পরিণত বয়েসে আর নেই। বৃষ্টির আভাসে যখন পথে ধুলো উঠেছে তখন তাঁর মনে হচ্ছে 'সাঁওতাল পরগণার মেঘ মদির আকাশ' ছেলেবেলার দিনগুলোর জন্য তাঁর মনে বেদনা জাগছে। সাঁওতাল পরগণার স্মৃতি মেদুর কবির মনে কিন্তু একথাও জাগে —

আর এখন বাড়ি ফিরে কী হবে।
তার চেয়ে ভালো
কাছাকাছি কোন বন্ধুর আড্ডা, কোন হস্টেল,
সেখানে উত্তেজনাহীন অশ্লীলতায়
কাটুক একটি সন্ধ্যা।

ছেলেবেলার জলে ভেজার আনন্দের পর বন্ধুর আড্ডায় বা হস্টেলে যিনি উত্তেজনাহীন অশ্লীলতায় সন্ধ্যা কাটাতে চান তাঁর মধ্যে এক বৈপরীত্য রয়েছে। সাঁওতাল পরগণার স্মৃতিতেও তাঁর সেই মনের ভাবনার ছবি পাওয়া যায়।

সাঁওতাল পরগণার নি:সঙ্গ স্তব্ধতা।
ধুলো ভরা নির্জন পথে মোটরের কর্কশ শব্দে
একটি হরিণের ঊর্দ্ধশ্বাস, ধাবমান বেগ
আর সেই ক্ষিপ্রগতি চঞ্চল রেখায়,
উর্বশীর দীর্ঘশ্বাস —

এখানে উত্তেজনা অশ্লীলতায় যেমন একটি বিশিষ্ট মানসিকতাকে বোঝা যায় তেমনি সাঁওতাল পরগণার স্মৃতির মধ্যে মোটরের কর্কশ শব্দের আমদানী করে বা উর্বশীর দীর্ঘশ্বাসে সেই মনটির পরিচয়ই আর একটু বিশদ হয়। কারণ সাঁওতাল পরগণা যে নাগরিক জীবনের ক্লান্তি থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তা আমরা জানি।

'নাগরিকা' নামেও সমর সেনের দুটো কবিতা রয়েছে 'কয়েকটি কবিতায়'।

প্রথম কবিতাটিতে ঘন অন্ধকার ও স্তব্ধতার মধ্যে একটি রমনীর বর্ণনা। কবির কাছে মেয়েটির শরীর 'কালো পাথরের মত,' আর চোখের দৃষ্টিতে আছে 'কীসের ক্ষুধার্ত দীপ্তি,' 'কঠিন ইশারা,' 'হিংস্র হাহাকার'। সচরাচর

নায়িকার দৃষ্টিতে দেখি আমরা সুদূরতা বা গভীরতার ছবি কিন্তু এখানে ক্ষুধার্ত কঠিন ইশারা বা হিংস্র হাহাকার থেকে কবির বিশিষ্টতা বোঝা যায়। বর্তমান জীবনের বিশেষণগুলিই তিনি এই নায়িকার ওপর প্রয়োগ করেছেন।

দ্বিতীয় কবিতাটিতেও প্রান্তরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে একটি ক্লান্ত শ্বেতাঙ্গিনী —

তারপর শীর্ণ হাতে
অলস, অলসভাবে ঠোঁটে মাখান রং,
আর পাউডার মুখে;

পরের স্তবকে মেয়েটি ভাবছে যদি হঠাৎ এখানে সমুদ্র এসে পিচের রাস্তাকে মুছে দেয়, মুছে দেয় বিশ্ব চরাচর এবং চোখের ক্লান্তি —

তাহলে আমার সমস্ত শরীরে কি আবার চকিতে আসবে
সমুদ্র মদির উর্বশীর স্বপ্ন ?

এই নাগরিকা নামের দুটো কবিতাতেই রমনীর আবির্ভাব ঘটছে অন্ধকারে আর দুজনেই ক্লান্ত বিধ্বস্ত। প্রথম মেয়েটির চোখে হিংস্রতা দ্বিতীয়জনের ক্লান্তি। অর্থাৎ দুজনেই নাগরিকা। চোখের ক্লান্তিতে, ঠোঁটের রঙ মাখানোতেও সেই প্রমাণ ছড়ানো। দ্বিতীয় নাগরিকা উর্বশী হতে চাইছে। উর্বশী স্বর্গের অপ্সরা— তার সাথে জড়ানো আছে স্বেচ্ছাচার ও রমনার অনুসঙ্গ। তাই মনে হয় 'নাগরিকা' এখানে শুধুমাত্র নগরে বাসকারী রমণী নয় নগরের অর্থাবনত অর্থের সাথেও তা যুক্ত। প্রথম নাগরিকার ক্ষুধার্ত ইশারা আর দ্বিতীয় জনের অবয়বে সেই কথাই তুলে ধরা হয়েছে।

উর্বশীর প্রসঙ্গ সমর সেনের কয়েকটি কবিতায় বার বার এসেছে। উর্বশী তাঁর কাছে অতীতের সৌন্দর্য, বর্তমানের ব্যর্থ বাসনা ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতীক। এই অতীত সৌন্দর্যের জন্য বর্তমানের মানুষ কামনার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কারণ বাস্তবের কঠিন মাটিতে উর্বশীর দেখা মেলে না। আধুনিক জীবনে স্বর্গের অপ্সরা রূপান্তরিত হয়ে যায় 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের' উর্বর মেয়েতে। উর্বশী নামক কবিতাটিতে দেখি —

তুমি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দূরন্ত মেঘের মতো।
কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে;
হে ক্লান্ত উর্বশী,
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষন্ন মুখে
উর্বর মেয়েরা আসে :
কত অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি,
কত দীর্ঘশ্বাস,
কত সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো,
আর কতদিন!

মধ্যবিত্তের জীবনে 'উর্বশী' আসে না। বর্তমানে উর্বশীর মত মেয়েদের যেতে হয় চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে। সেখানে অন্যের মনোরঞ্জনে নিজেদের জীবনকে ক্ষয় করে, ক্লান্ত করে। তাদের বিষন্ন মুখে লেগে থাকে তিক্ততার রেশ। উর্বশীর স্বপ্ন আজ তাই অবাস্তব। এখানে কবিতার বিষয় আর চিত্তরঞ্জন সেবাসদন নামের তির্যকতা কবির নাগরিক মননজাত।

'মুক্তি' নামক কবিতায় — স্বপ্নের দেশে যেখানে শিশিরই বসন্ত নামবে সেখানে গিয়ে 'কোন একটি মেয়েকে' ভুলতে চাইছেন, ভাবছেন —

'একটি মানুষকে ভুলতে কতোদিনই আর লাগে,
কতো দিনইবা লাগে শরীর থেকে মুছে ফেলতে
আর একজনের শরীর সর্বস্ব আলিঙ্গন,
মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস,
স্যাকারিনের মতো মিষ্টি
একটি মেয়ের প্রেম।

এরপর তিনি ভাবছেন সেই স্থানের কথা যেখানে বসন্ত আসে না, সাইকেলে করে ঘরে ফেরা কেরাণীর ক্লান্তি যেখানে লেগে থাকে, যেখানে —

ডাস্টবিনের সামনে
মরে যাওয়া কুকুরের মুখের যন্ত্রণায়
সময় কাটে'–সেখানে সেই প্রেম ভোলা সহজ নয়।

প্রেমকে শরীর সর্বস্ব আলিঙ্গন।মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস বলে মনে করা, মিষ্টি মেয়েকে স্যাকারিনের সাথে তুলনা করা কবিতাটি লক্ষণীয় দিক। সেইসঙ্গে সাইকেল ফেরা কেরাণী বা ডাস্টবিনের সামনে মরা কুকুরের চিত্রকল্পগুলিও তাৎপর্যপূর্ণ।

স্পষ্ট ভাষায় শহরের ছবি তিনি এই কবিতাগুলিতে দেখান নি। কিন্তু তাঁর ভাবনা, প্রথাসিদ্ধ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেখে তাঁর মানসিকতার অবস্থান তো বটেই এমন কি কবিতার ভবিানুষঙ্গ যে একান্ত নাগরিকতা সহজেই অনুমান করা যায়।

স্পষ্ট ভাবে শহরের বা আরো নির্দিষ্ট করে বললে, কলকাতার ছবি আছে 'নাগরিক,' 'স্বর্গ হতে বিদায়,' 'একটি বেকার প্রেমিক'

কবিতায়।

নাগরিক কবিতায় 'মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি' বলে যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা কোলকাতা শহরের। রোলারের শব্দ, গলানো পিচের গন্ধ, আর ইঁটের অরণ্য নিয়ে যে শহর গড়ে উঠেছে এই কবিতা তারই।

মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি
*** *** *** *** ***
আর কত লাল শাড়ী আর নরম বুক, আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ
আর হাওয়ায় কত গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ,
হে মহানগরী!
যদি কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে
স্কুল আর কলেজ হলো শেষ, ক্লাইভ স্ট্রীট জনহীন,
দশটা পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে
সন্ধ্যা নামল :
মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ,
দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, চিৎপুরে ভিড়,
কাল সকালে কখন সূর্য্য উঠবে।
কলেরা আর কলের বাঁশি আর গণোরিয়া আর বসন্ত
বন্যা আর দুর্ভিক্ষ
পৃথিবী বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা:

এই বর্ণনায়ক্লাইভ স্ট্রীট, দশটা পাঁচটার ভিড়, চিৎপুর এসবের মাঝখানে থেকে আমরা পাই আমাদের চেনা শহরটির ছবি। কোলকাতাকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে

ঘৃণা করা, এই শহরের সঙ্গে নিয়তির মত অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়ার কথা দিয়ে কবিতাটি অসাধারণ করে তুলেছে —

যতদূর চাই ইটের অরণ্য,
পায়ে চলা পথের শেষে কান্নার শব্দ।
ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো
হে মহানগরী।
রুদ্ধশ্বাস রাত্রির শেষে
জ্বলন্ত আগুনের পাশে আমাদের প্রার্থনা,
সমান জীবনের স্পষ্ট চকিত স্বপ্ন —

সমান জীবনের প্রতি তাঁর আকাঙ্খাও এই শহরকে ভালবেসেই জেগেছে তাই তিনি ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চরণের জন্য অপেক্ষা করছেন।

'স্বর্গ হতে বিদায়' কবিতায়ও কোলকাতা শহরের বর্ণনা দিয়েছেন —

ম্লান হয়ে এল রুমালে
ইভনিং ইন প্যারিসের গন্ধ—
হে শহর, হে ধূসর শহর!
কালিঘাটের ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও
নষ্টের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে শহর, হে ধূসর শহর।

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন এই শহরের কবি, সেই ধ্বনি বর্তমানের মুখে উন্মত্ত মূল্যবোধহীন পৃথিবীর। তাই সেই ধ্বনি নষ্টের মত।

এই পৃথিবীতে লোকের ভিড়ে দেখা যায় উর্বশীর নাচ — সেই উর্বশীরা দশটাকায় কেনা কয়েক প্রহরের আমোদের বস্তু মাত্র। তাকে নিয়ে তাণ্ডব উল্লাসে মেতে উঠে 'অমৃতের পুত্র'রা। এদের কাছে প্রেম অবিনশ্বর নয় —

মোটরে আর বারে
আর রবি বারে ডায়মণ্ডহারবারে
কয়েক টাকায় কয়েক প্রহরের আমার প্রেম —

একালের নায়কেরা পুরুরবা নয়, 'আমি নহি পুরুরবা হে উর্বশী' তাই এদের প্রেম ক্ষণস্থায়ী — বিরহে কোন সৌন্দর্য নেই। কালিদাসের যুগের প্রেম এই পৃথিবীতে এই শহরে অচল, রবীন্দ্রনাথের ভাবনার অমৃতের পুত্র মানুষ ও আর নেই।

কালীঘাটের ব্রিজের ওপর লন্টের শব্দধ্বনি যেমন স্থানটিকে চিহ্নিত করছে তেমনি দৈবী মহিমাতেও আঘাত দিচ্ছেন কবি। শুধু তাই নয় বর্তমান সভ্যতা যাত্রা করছে কোন অতলের দিকে তাও যেন দেখান।

'পোস্ট গ্রাজুয়েট' কবিতায় 'দিকে দিকে আজ হানাদেয় বর্বর নগর' বলে নগরায়নের আগ্রাসীতাকে দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে বলেছেন— লাবণ্যের প্রেম অথবা অন্ধকারে 'নতুন জীবনের স্বপ্ন' বইয়ের পাতাতেই সম্ভব — জীবনে নয়। কারণ জীবনে রয়েছে শান্টিং স্টেশনের কর্কশ কোলাহল, খনির দীর্ঘ অন্ধকার, তিলে তিলে রুদ্ধশ্বাস মৃত্যু। বর্বর নগরের আঘাতে মানুষের জীবন মরুভূমির মত শূন্য হয়ে উঠেছে।

একটি বেকার প্রেমিক কবিতাতেও তিনি শহরের কথা বলেছেন —

চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি

* * * * *

খিদিরপুর ডকে রাতে জাহাজের শব্দ শুনি,

* * * * *

আর শহরের রাস্তায় কখনো বা প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
আর মদির মধ্য রাতে মাঝে মাঝে বলি
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হয়নো ইশাইয়ের মতো উদ্যত দিন।
কলকাতার ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙ্গে
আর সমস্তক্ষণ রক্ত জুলে
বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

কলকাতার ক্লান্ত কোলাহল, চিৎপুর বা খিদিরপুরের ডক, কোথাও কালীঘাট সুনির্দিষ্ট ভাবে শহরকে বাস্তব করে তোলে। বিংশ শতকের প্রথম দিকের কলকাতা তার ভৌগলিক যাথার্থ্য, তার জীবনযাপনের বিশিষ্টতায় সত্য হয়।

এই কাব্যগ্রন্থটির কয়েক জায়গায় মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন —

ক) তুমি যেখানেই যাও,
কোনো চকিত মুহূর্তের নিঃশব্দতায়
হঠাৎ শুনিতে পাবে,
মৃত্যুর গম্ভীর, অবিরাম পদক্ষেপ। [১০]

খ) আমাদের মৃত্যু হবে পাণ্ডুর মতো। [১১]

গ) মহান মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় নেই,
বিদ্যুতের আলোয়,
তিনে তিনে মৃত্যু রুগ্নশ্বাস মৃত্যু আমাদের প্রাণ। [১২]

এই মৃত্যু ভাবনা, মহান বা রাবীন্দ্রিক নয়। তা যেন রুগ্নশ্বাস পাণ্ডুর মত নির্মম মৃত্যু। হতাশা, দুঃস্বপ্ন আর ক্লান্তির উৎস জাত এই মৃত্যু ভাবনা। শুধু তাই নয়, আধুনিক মনন সভ্যতার শিখরে সমাসীন বিশ্বের নিষ্করুণ ও অপঘাত বিনষ্টির কথা অনিবার্য বলে মেনে নেয়। মৃত্যু অমৃত নয়— সর্বনাশা অংক। তারই প্রতিফলন সমর সেনের মৃত্যু ভাবনায়।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই সমর সেন নাগরিক কবি হিসাবে একটা ইমেজ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর কবিতাগুলির আলোচনায় সেকথা যেমন বোঝা যায় তেমনি সেই সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকেও তা জানা যায়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন :

" নাগরিক জীবন আমরা আরম্ভ করেছি অনেকদিন, কিন্তু আমাদের কাব্যে এ পর্যন্ত বেশির ভাগই পাওয়া গেছে রাখাল বালকের চোখে পল্লী প্রকৃতির ছবি। নাগরিক জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবি উল্লেখ কোনো কোনো আধুনিক কবিতে থাকলেও সমগ্রভাবে আধুনিক নগর-জীবন সমর সেনের কবিতাতেই ধরা পড়ল। সমর সেন শহরের কবি, কলকাতার কবি, আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিকার, বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি। ঠিক যেন শহরের সুরটি ধরা পড়েছে তাঁর ছন্দে।" [১৩]

আবির্ভাবের অল্পকালের মধ্যেই নাগরিক জীবনের কবি

হিসাবে যে স্বীকৃতি পেয়েছে পরবর্তী সময়ের সমালোচকদের কাছেও তিনি সেই স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সমর সেন বিষয়ে লিখেছেন —

সমর সেন চল্লিশের দশকের প্রথম প্রতিনিধিস্থানীয় নাগরিক কবি। পূর্ববর্তী তিরিশের কবিদের মধ্যেও কেউকেউ কবিতায় নাগরিক পরিবেশকে স্পষ্ট করে এঁকেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দের কোনো কোনো কবিতা স্মরণীয়। তৎসত্ত্বেও সমর সেনের কবিতায়ই এই প্রথম নাগরিক জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, আর্তি ও হতাশা ব্যাপকরূপে প্রতিবিম্বিত হলো। [১৪]

সমর সেনের নাগরিক কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটেছিল তাঁর কয়েকটি কবিতা থেকেই॥

॥ তিন ॥

'গ্রহণ' সমর সেনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ — প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪০ সালে। পরে সংকলন প্রকাশের সময়, ১৯৩৭ - ৪০ এই সময়ের মধ্যে কবিতা গুলিকে রাখা হয়েছিল এবং গ্রহণ নামটি বর্জন করেছেন কবি।

সমর সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামের মধ্যে কোন বিশেষ ব্যঞ্জনা ছিল না। 'কয়েকটি কবিতা' নামটি সাধারণের চাইতেও সমান্তরাল। কিন্তু গ্রহণ নামটি তা নয়। এই নামের মধ্য দিয়ে তিনি জীবন ও সময়ের নিদারুণ অবক্ষয়কে যেন খানিকটা রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। বিশ্বযুদ্ধ তখন শুরু হয়েছে ফলে বড় ধরণের অবক্ষয়ের আরম্ভও ঘটেছে। এই ক্ষয় তাঁর কাব্যগ্রন্থের নামকরণে ছাপ ফেলেছে।

এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি তিনটি ভাগে ভাগ করা। প্রথম অংশের কোন নাম নেই। এই অংশে মোট ছয়টি কবিতা আছে। দ্বিতীয় অংশের নাম 'বর্মশেষ' এতেও ছয়টি কবিতা রয়েছে। তৃতীয় অংশ 'গ্রহণ' এতে আছে দশটি কবিতা। অর্থাৎ মোট বাইশটি কবিতা এই কাব্যগ্রন্থে রয়েছে। কবিতাগুলি অধিকাংশই 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা' নামে সংকলিত হয়।

গ্রহণের প্রথম কবিতা 'অখ্যাত নায়ক' এই নায়ক শহরের। তার ঘোরাফেরা শহরের মধ্যে, যে শহর-কোলকাতার কথা মনে করার। তার মানসিকতাও নাগরিক।

বাসের সামনে ভিখিরিরা ভিড় করে,
হাওয়ায় মেঘের শব্দ
আর বৈশাখের বৃষ্টিতে ভেজা অপরূপ শহর।

পঙক্তি তিনটি একটা চেনা দৃশ্য রচিত করে। শহর শব্দটি সেই দৃশ্য রচনায় সাহায্য করে। তারপর 'মোটরের সীটে দেখি' শনিবারের বিলাস' 'হর্ণের আকস্মিক শব্দ' 'মৃধর রাস্তা' আর মাঠের অন্ধকারে প্রেমিক ফিরিঙ্গির ভিড়' — সেই ছবিকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। আর এই শহর কলকাতা শহর বলেই মনে হয় কারণ ফিরিঙ্গির ভিড় বা শনিবারের বিলাস মফঃস্বলে পাওয়া সম্ভব নয়।

গম্ভীর শব্দে শহরের উপরে আকাশ কাঁপে,
নিচে বিবর্ণ বস্তি
আর হলুদ ঘাসের মাঠ।

শহরের আকাশ শান্ত নয়, যান্ত্রিক যানের চলাচলে তা কম্পিত। এখানে বস্তি-বিবর্ণ, মাঠের ঘাসও নিষ্প্রাণ হলুদ। এই বিবর্ণতা এসেছে যন্ত্রের আগ্রাসিতা থেকে। এই যান্ত্রিকতা এমে কবিতার নায়ক তথা সকল মানুষকেই শ্বাসরুদ্ধ করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

তৃতীয় কবিতা 'ঘরে বাইরে'তে কবির জীবনের প্রতি বিমুখ কবি মনটি উপস্থিত। কবিতার আরম্ভে তিনি যে লাইনটি ব্যবহার করেছেন I have been born, and once is enough - - - - — তাতে জীবনের প্রতি বিরাগই প্রকাশিত। কবিতার ভিতরে গেলে দেখা যাবে যে, জীবন এবং পৃথিবী এই দুইয়ের প্রতিই তাঁর যুগপৎ আশা ও নিরাশার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন —

তোমার ক্লান্ত উরুতে একদিন এসেছিল
কামনার বিশাল ইশারা!

ট্যাকেতে টাকা নেই
রঙিন পণিকার দিন হলো শেষ
আজ জীবনের কুঁজ দেখি তোমার গর্ভে,
'সেইদিন নৃত্য হোক, যেদিন পুরুষ পৃথিবীতে আসে।'
সময়ের চূর্ণ পাহাড়ে শিঙ্গিল মানুষেরা ঘরে,
কর্কশ কাকের কণ্ঠে শুনি ধ্বংসের গান,
আর গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ
তোমাকে নিরন্তর কাপুরুষ প্রহার করে
সেইদিন নৃত্য হোক যেদিন মানুষ পৃথিবীতে আসে।

মানুষ এবং পৃথিবীর প্রতি কবি বীতশ্রদ্ধ আর তার কারণ দারিদ্র, অসুন্দরতা ও কাপুরুষতা। মহাযুদ্ধের ভগ্নদূত যখন দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছে তখনো মানুষের চৈতন্য জাগ্রত হচ্ছে না বা মানুষ তখনো বিনাশে মত্ত এই অদ্ভুত স্বার্থপর পৃথিবী তিনি যেন চান না।

এই অবস্থায় কবির স্মৃতিতে হঠাৎ যেন ভেসে আসে একটি শহরের কথা, যে শহর ঢাকা ছিল শালবনের অন্ধকারে, পাহাড়ের মত প্রাসাদ ছিল যেখানে, আর ছিল প্রেম। সেই সুন্দর নগর- কল্পনা থেকে তিনি বাস্তবের কঠিন মাটিতে নেমে আসেন —

আর আজো তো আছে
কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুমু,
স্ফীতোদর দাম্ভিক স্বামীর পিছনে গর্ভবতী সতীসাবিত্রী,
আর বন্যার মতো পুত্রকন্যা, অরণ্যে রোদন;
হে ঈশ্বর, এ কী অপরূপ।
অনুর্বর বালুর উপরে
কর্কশ কাকেরা করে ধ্বংসের গান।

অন্তঃসার শূন্য এই সমাজে ধীরে ধীরে যে ধ্বংস ঘনিয়ে আসছে তাকে ত্বরান্বিত করে মহাযুদ্ধ আর 'নীলরক্ত-বান নীলকর কবন্ধ'। এই ধ্বংস, মৃত্যু বা ক্লান্তিতে কিন্তু সমর সেন কবিতাটি শেষ করেন নি। হঠাৎ করে তিনি কবিতার শেষে বিপ্লবের স্বপ্ন এঁকে দিলেন। এই স্বপ্ন বা আশা সমর সেন সুলভ হয়তো সর্বাংশে নয়। তবু একারণে উল্লেখযোগ্য ধ্বংসের কালের মাঝেও মানুষ, নাগরিক মানুষও সুন্দরের স্বপ্ন দেখে —

তবু জানি, কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী
যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে,
তবু জানি,
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশ গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে

যতদিন তা না হয় ততদিন মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার চলতে থাকবে।

'সন্ধ্যা ও প্রভাত' কবিতায় তিনি কোলকাতা শহরের সন্ধ্যাও প্রভাতের বর্ণনা দিচ্ছেন।

শুধু জনহীন চৌরঙ্গীতে পাথরের মূর্তি,
খনির আগুনে সূর্যাস্ত আসে।

আবার পরদিন 'শহরের প্রখর সকালে' কবি দেখেন লাল জীবনের জাল। দূর থেকে ভেসে আসে শবযাত্রার ধ্বনি। এই মৃত্যু জীবনের ব্যর্থতায় আসে। কবি দেখতে পান—

—বসন্তের কার্জন পার্কে
বর্ষার সিক্ত পশুর মতো স্তব্ধ বসে
বজ্রদেহ নায়কের দল
বিগলিত বিমনতায় ক্ষুরধার স্বপ্ন দেখে;
ময়দানে কটনীড় মানুষের দল।

ফরাসি ছবির আমন্ত্রণে, ফিটনের ইঙ্গিতে আহ্বানে
ধনির আগুনে রক্ত-মাখে সূর্যাস্ত এল।

যে জটিল জাল শহরের আকাশে ছড়ানো সেই জালে শহরের মানুষ আবদ্ধ। এরা যখন কার্জন পার্কে বসে আছে তখন মনে হয় এরা যেন পশুর মতো স্তব্ধ — বোধহীন বুদ্ধিহীনপশুতে পরিণত এরা। আর একদল ঘুরে বেড়ায় ময়দানে—এদের জীবনের নীড় নষ্ট — মূল্যবোধহীন এরাও ফিটনের ইঙ্গিত বা ফরাসি ছবির আমন্ত্রণ এই বোধহীনতাকে স্পষ্ট করে। এরই মধ্যে সূর্যাস্ত আসে, আসে ধনির আগুনের মত লাল হয়ে। দুবারই সূর্যাস্তকে তিনি ধনির আগুনের লালের সাথে তুলনা করছেন। হয়তো ধনি বলে—শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনের জাল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এই ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

কবিতাটিতে শহর, কার্জন পার্ক, চৌরঙ্গী, ময়দান শব্দগুলি কোলকাতাকে চিহ্নিত করছে।

'কয়েকটি দিন' কবিতার শুরুতে তিনি বলছেন —

নদীর জলে
শৈশবে দেখেছি গলিত উলঙ্গ শব।

শৈশবের কোন মধুর স্মৃতিতে কবিতার আরম্ভ নয়, আরম্ভ হচ্ছে রূঢ় কঠিন মৃত্যুতে। তারপর তিনি প্রকৃতির বর্ণনা দিচ্ছেন বলছেন, গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল আসে দেখেছেন, শেয়াল অথবা কোকিলের ডাকও শুনছেন। যে স্থানের বর্ণনাটি দিচ্ছেন তা শহর নয় —'শহর হতে বহুদূরে'। এখানেও কিন্তু দূরত্ব পরিমাপের একদিকে শহরকে রেখেছেন তা লক্ষ্য করার মত।

এরপর তিনি পৃথিবীর অবস্থার কথা বলছেন। বলছেন,

পৃথিবীতে সৃষ্টিহীনতার অন্ধকার নেমেছে দীর্ঘ দিন, করাল রৌদ্র আর তারই মাঝে ধাবমান কাল'। গ্রামে গ্রামে কাবুলিরা এসে হানা দেয়, বর্বর ভাষায় বকে যায়। চায়ের দোকানে ভিড় করে বিকট মানুষেরা। চারিদিকে মড়কের কোলাহল ওঠে, তার মধ্যে শোনা যায় 'নতুন শিশুর কান্না'। এই মৃত্যু আর জন্ম যেন 'বেলাভূমির সমুদ্রের শেষহীন সঙ্গম'। এই ধ্বংস আর মৃত্যুর মধ্যে কবি যে ভবিষ্যতকে দেখছেন তা দুঃস্বপ্ন

বৃদ্ধ শিশু আর বুদ্ধিহীন বৃদ্ধের দল
স্খলিত দাঁতের ফাঁকে কাঁদে আর হাসে
ট্রামে আর বাসে,
দূরে পশ্চিমে
বিপুল আসন্ন মেঘে অন্ধকার স্তব্ধ নদী।

আসন্ন যুদ্ধ পৃথিবী থেকে যৌবনকে নিশ্চিহ্ন করবে, থাকবে 'বৃদ্ধ শিশু' আর বুদ্ধিহীন বৃদ্ধ'। পৃথিবীর জন্য সেই সময় বড় সুখের সময় নয়।

কবিতাটিতে যুদ্ধে মগ্ন যে পৃথিবীর বর্ণনা দিয়েছেন, মন্বন্তরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বেদনা বিদ্ধ একটি মনকে ছোঁয়া যায়। গ্রাম শব্দটি এখানে উচ্চারিত হলেও এই গ্রাম আমাদের চেনা পল্লী গ্রাম নয়— এই গ্রাম শহরের ছায়া মাত্র। আসন্ন যুদ্ধের প্রভাবে এই গ্রামেও নেমেছে অভাব— মানুষ ঋণগ্রস্থ, অযথা ক্ষতান্তরে তারাও সময় নষ্ট করে। তাই একে চিরাচরিত পল্লী গ্রাম বলে মনে হয় না।

'একটি বুদ্ধিজীবী' কবিতাতেও তিনি আসন্ন যুদ্ধের বর্ণনাই দিয়েছেন। যখন পৃথিবীতে শান্তি নেই 'লোকারণ্যে ঐশ্বর্যের সূর্য ছড়ায় ছায়ার দুঃস্বপ্ন' তখন বুদ্ধিজীবী তার সময় কাটায় অদ্ভুত নিস্পৃহতায় —

'নিষ্ফল দিন কাটে ক্ষয়রুগীর কামার্ত প্রার্থনায়,
তাই ঘরে বসে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিচলিত শুনি,
আর ব্যর্থ বিলাপের বিকারে বলি :
আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই,
তাই ধ্বংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন
সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে
অতৃপ্তরতি উর্বশীর অভিশাপ।

এই বুদ্ধিজীবী আধুনিক শিক্ষিত মানুষের প্রতিভূ। উদ্যমহীন সময় কাটায় বিকারে আর বিলাপে। শিক্ষিত মানুষ নপুংসক মনের অধিকারী তাই এদের জন্য রয়েছে 'বন্ধ্যাভূমি আর নিষ্ঠুর দিগন্ত'। যুদ্ধে উন্মত্ত পৃথিবীতে নিস্পৃহ নির্জীব ভাবকে কবি তীক্ষ্ণ বিদ্রুপে বিদ্ধ করছেন এই কবিতায়।

'বর্ষশেষ' অংশের প্রথম কবিতা 'চিত্রাঙ্গদা'। এই কবিতাতেও অসুস্থ এক পৃথিবীর ছবি তুলে ধরছেন। এই অসুস্থতা আধুনিক মননজাত।

শোনো, শিশুর কান্নার মতো পাখির শব্দ।

বা,

আমাদের পিরীতি বালুর বাঁধ,
গণিকার প্রেম আমাদের উজ্জ্বল পৃথিবী।

অথবা,

ক্লীবের কুণ্ডল কানে, বিজয়ী অর্জুন আজ
পণ্যযুবতী সংকুল পথে সঙ্গোপনে ঘোরে,
কালের মুখিত ক্ষত ম্লান মুখে।

এইসব পঙক্তি কবির ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের আর্তিকে মূর্ত করে তোলে।

পরের কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে'। এই কবিতায় তিনি 'পড়ন্ত রোদে নগর লাল হলো' দেখে মনে করছেন বহুদূর দেশের কথা, যেখানে পাহাড়ের ছায়া এসে পড়ে প্রান্তরে, অন্ধকারে নদীর ধারা বয়ে চলে— সেই দেশে ফিরতে চাইছেন। লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কল্পনা লোক থেকে বাস্তবে ফিরতে চেয়েছেন — সমর সেন যেন নগর বাস্তবতা থেকে দূর দেশে ফিরতে চাইছেন।

'সংক্রান্তি' কবিতায় বৃদ্ধ আহুরে পীত বসন্তের খবর আছে। এই শহরে বসন্ত আসে 'ফয়রুপীর কাশি পাগলের হাসি আকাশে' ভাসিয়ে; মৃত্যুর বন্যা নামে। মাঝে মাঝে বাঁচার আশা, প্রাণের আশা জাগে কিন্তু তা স্থায়ী হয় না।

মাঝে মাঝে ধানের সবুজে অগ্নিরেখা দেখি
সুদূর প্রান্তরে,
তারপর আসুন ভবিষ্যৎ
পঙ্গপাল সর্বনাশে বিদীর্ণ ধূসর।

শহরকে বৃদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা বা বসন্তকে পীত বলে কল্পনা করা কবির বিশেষ মানসিকতাজাত।

'বর্মশেষ' গ্রন্থের অন্য তিনটি কবিতা 'বসন্ত' 'একটি কবিতা' 'বিরতি' — এতে আসন্ন মহাযুদ্ধের কথা আছে। সচেতন কবির পক্ষে এই যুদ্ধ বা যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখে চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। আর বিশ্বযুদ্ধের প্রবলঅভিঘাত উপলব্ধি করতে বেশী সক্ষম হয়েছিল শহরের শিক্ষিত মানুষেরা। তাই তাঁদের চিন্তায় বা কাজে তখন সেই উপলব্ধির ছবি কোন না কোন ভাবে উঠে

আসছিল। তাই সেই যুদ্ধই এখানে কখনো অদৃশ্য পাহাড়ে বজ্রধ্বনি হয়ে, কখনো বা কানো হাওয়ায় গান ভাসিয়ে আমাদের স্মরণে এসেছে। একটি কবিতায়' রয়েছে আশ্চর্য তীক্ষ্ণ বাক্য ভঙ্গী —

বয়স তো হলো, আর কেন ভীমরতি,
প্রভুহীন কুকুরের মতো আর কতকাল।
আপন চর্চায় শুধু শূন্য ফানুস ফাঁসে,
বিধি হলে বাম
আপনি বাঁচলে বাপের নাম
সেদিন নেই।

এই ব্যঙ্গ সমর সেনকে বুঝতে সাহায্য করে।

বর্ষশেষের পরের অংশ 'গ্রহণ'— এই অংশের কবিতা গুলি বিষ্ণু দেকে উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রথম কবিতা ' For Thine is the Kingdom- কবিতাটিতে 'শহর' শব্দটির উল্লেখ আছে —

দারুণ গ্রীষ্মে অভিশপ্ত ব্যাকুল মন
তোমার আদেশে শহরের দিগ্বিজয়ে ঘোরে—

শুধুমাত্র 'শহর' শব্দ নয় আরো কিছু পঙক্তি দিয়ে তিনি কলকাতাকে চিনিয়ে দেন —

এ্যাসেমব্লি হলে বিরহছলে মিলন আনো

বা,

বিরস কাজের সূত্রে
কতোদিনের ক্লান্তিতে কানের বাঁশি বাজে
পিছনে সময়ক্ষণ ক্ষিপ্রগতি বাসের শব্দ।

এছাড়া তিনি কবিতাটিতে আমাদের পরিচিত কিছু পঙতির বা শব্দের ব্যঙ্গাত্মক পরিবর্তনও করেছেন —

ক. এ্যাসেমব্লি হলে বিরহছলে মিলন আনো

খ. তাই বঙ্কিম ব্রহ্ম যীশু পরমহংস
সময় যখন আসে তখন সকলই মানি

গ. ভারি ট্যাঁক ছাড়া কিছুই টেকে না,
সবার উপরে আমিই সত্য,
তার উপরে নেই।

বিষয়বস্তু এবং এইসব শব্দ ও পঙতি ব্যবহার কবিতাটির উপরে শহুরে রঙ বুলিয়ে দেয়।

পরের কবিতা 'ত্রিসমাস'-এ মহানগর শুধু চিহ্নিতই থাকে নি তার রূপ ও স্বরূপ নিয়ে প্রকাশিত —

শূন্য মাঠে কোটরহীন চোখের মতো গ্যাসের আলো জ্বলে,।
কার্নিভাল সুরু হলো, রেসখেলা শেষ,
কঙ্কালবর্ণ কুয়াশায় দেখা ছেয়েছে নগর।
এখনো আলোছায়া দোলে কারো-কারো চোখে,

শূন্য মাঠে, গ্যাসের আলো, রেসখেলা, কার্নিভাল ইত্যাদি নিয়ে কোলকাতা নগরটি কবিতার পাতায় উঠে গেছে। নগরের বিবর্ণতা বোঝাতে ব্যবহার করছেন 'কঙ্কালবর্ণ কুয়াশা' এই বিশেষণ। সচরাচর সমর সেন ধূসর শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। হয়তো মৃত্যুর সর্বব্যাপ্ত রূপে প্রভাবিত হয়ে কঙ্কালবর্ণ ব্যবহার করেছেন। তবে শব্দটির অভিঘাত এখানে তীব্রতর হয়েছে।

'বিতর্ক' কবিতায় 'বর্তমান মুমূর্ষু, ভবিষ্যৎ হোঁচটে'তে এই অবস্থায় 'এই দুর্মুখ পৃথিবীকে পিছনে রেখে' শেয়াল সংকুল কোনো নির্জন গ্রামে সরে পড়তে চাইছেন। যদিও বুদ্ধিজীবী এই কবি জানেন পলায়ন সম্ভব নয় কারণ বিনাশের কাল চিরদিন থাকবে না। তিনি জানেন ——

হয়তো অনেক যন্ত্রণার পর
নগর মন্থনে নীলকণ্ঠ আকাশের তলে
এক শ্রেণীহীন সাম্য রাজ্যপাশে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত পৃথিবী।

অনেক যুদ্ধ অনেক যন্ত্রণার পর বিষে নীল হয়ে যাওয়া এক পৃথিবী দেখা যাবে। সেই সঙ্গে দেখা যাবে 'প্রায় ব্রজবুলির মতো মধুর নতুন প্রেমে'র রোমন্থন।

কিন্তু এই পুনরাবৃত্তি, চরমতম সর্বনাশের দিনের স্মৃতি ভুলে যাওয়ার চাইতে 'চকিত মৃত্যুর চরম লজ্জা বুঝি ভাল।' অথবা মৃত্যুর চাইতেও ভাল বা সবচেয়ে ভালো

জন্ম মৃত্যুর এই মধ্যস্থ পৃথিবীতে
নিরপেক্ষ মড়কের বীজ হয়ে আসা।

মানুষের প্রতি অশেষ হতাশায় ক্লান্ত কবি এখন আর মানুষ নয় — মড়কের বীজ হয়ে আসতে চাইছেন পৃথিবীতে। ধ্বংসের দিনে যে শত্রু-মিত্রের ভেদাভেদ রাখবে না।

এই কবিতায় 'শেয়াল সংকুল' যে গ্রামটির ছবি সমর সেন দিচ্ছেন তা এরকম —

নদীর উপরে যেখানে নীল আকাশ নামে
গভীর স্নেহে,

শেয়াল সংকুল কোনো নির্জন গ্রামে
কুঁড়ে ঘর বাঁধি;
গরুর দুধ, পোষা মুরগির ডিম, ক্ষেতের ধান,
রাত্রে কান পেতে শোনা বাঁশবনে মশার গান,
যেখানে দুপুরে শ্যাওলায় সবুজ পুকুরে
গরুর মতো করুণ চোখ
বাংলার বধূ নামে,
নিরালা কাল আপন মনে
পুরনো বিষন্নতা হাওয়ায় বোনে।

এরই পাশাপাশি শহরের কথা তিনি বলছেন — অনেক যন্ত্রণার পরে নগর মন্থনে নীল আকাশের নীচে নতুন পৃথিবী গড়ে উঠবে। তাঁর আঁকা গ্রামের ছবিটিতে এই মন্থনের কোনো আভাস নেই। বরং এই ছবি থেকে আসন্ন যুদ্ধের ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। কিন্তু বস্তুত: পক্ষে সেই সময়কার গ্রামগুলির অবস্থা এত সুন্দর শান্ত ছিল না। নগরের মত বিধ্বস্ত্র অবস্থা না হলেও তখন গ্রাম বাংলার অবস্থাও খারাপই ছিল। আদ্যন্ত শহরের কবি সমর সেন সম্ভবত সেই অবস্থার কথা সম্যক জানতেন না অথবা তাঁর কাছে নগরের দুর্দিনই বেশী ভয়াবহ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

গ্রহণ অংশের অন্যান্য কবিতাগুলিতে (অজ্ঞাতবাস, পলাতক, বকধার্মিক, গ্রহণ, যাত্রা, শেষসন্ধ্যা) কঠিন সময়, সময়ের চাপে চাপাপড়া মানুষ, পলায়নপর মধ্যবিত্ত সমাজ, সমাজের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার কথা আর কখনো সেই অবস্থার মাঝে চকিত কোন উত্তরণের আশা বিষয়বস্তু হিসাবে এসেছে। এই সব বিষয়ের মাঝেও দেখা যায় কখনো নগরজীবনের প্রত্যক্ষ ছবি, কখনো বা কলকাতার বিশেষ কোনো অঞ্চলের নাম কখনো তীক্ষ্ণ তীব্র কোন মন্তব্য — তারই মাধ্যমে কবি সমর সেনকে চেনা সহজ হয়ে ওঠে। 'অজ্ঞাতবাস' কবিতায় বলছেন

আমি যাত্র
যেছুনির সামনে সরস কেরানি—

যেছুনি বা কেরানি শব্দ দুটি বা সমগ্র পঙক্তিটি শহরের বাজারের ছবি তুলে ধরে তুচ্ছতায় গ্রস্ত মানবিক অস্তিত্বকে তা যেন বিদ্ধ করে।

'বকধার্মিক' কবিতার বেশ কিছু পঙক্তি উদ্ধৃতির যোগ্য —

ক. এরোপ্লেনের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় ওড়ায়
বকমুখ মন্ত্রীর নাম।

খ. সখি, শেষে কি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরে
ব্রহ্মচারী বেশে পণ্ডিচেরী যাব।

গ. ফেরি স্টিমারের ওপারে হাওড়ার পোল তোলা

ঘ. রাস্তায় হাসির গররায় ঘোরে তুখোর ইয়ারের দল,
রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল মাতাল,

ঙ. আবার ব্রাহ্ম মুহূর্তে
চিৎপুরের বারান্দায় কোকিল ডাকে,

এখানে হাওড়ার পোল, চিৎপুর, তুখোরইয়ার, গুলিখোর গেঁজেল মাতালে মিলে নগর কলকাতার নতুন এক 'হুতুম প্যাচার নকসা'। নবযুগের চিহ্ন বকমুখ মন্ত্রী এরোপ্লেন শব্দে।

'গ্রহণ' কবিতায় কবি —

জনহীন বাসে চেপে
ময়দানে উধাও।

'ময়দান' আমাদের কাছে কলকাতার স্মৃতি জাগায়। আবার

কীসের আগুনে আদিম আকাশ
নিঃশব্দে নেমে আসে,
শ্বাসরোধ করে আমার নাগরীর।

এখানেও নগরের শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা থেকে কলকাতাকেই পাই। 'কানাকড়ি' কবিতায় 'ছিন্নভিন্ন সময়ের জানে / বন্যার জলে মাছ ধরার' সূক্ষ্ম রসিকতায় কবির তির্যক বাচনভঙ্গী প্রকাশিত।

'শেষ সন্ধ্যায় 'সিনেমার সামনে রুদ্ধশ্বাস ঊর্ধ্বমুখ মানুষের ভিড়'ও শহরজীবনের ছবিকে তুলে ধরে।

'গ্রহণ' কাব্যগ্রন্থের প্রায় সব কবিতারই সাধারণ বৈশিষ্ট্য আসন্ন দুঃসময়। সময়ের মুখে গ্রহণের কালো ছায়া নেমেছে বলে কবির বিশ্বাস। এই অবস্থায় মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থা দেখা গেছে— কবি নিজেও সেই সমাজের প্রতিনিধি। তাই তিনি গ্রহণ করেছেন এক বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গী। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এক সময় গ্রহণের সমালোচনায় লিখেছিলেন,

" সমরবাবুর বইয়ের যেকোন পাতা খুললেই বোধ হয় শ্লেষের কবিতা পাওয়া যায়, ...। এই বিদ্রূপ কবিতার কারণ তাদের শ্রেণী ভিত্তি। প্রকৃতপক্ষে এঁরা কেউই প্রোলেটারিয়েট দলভুক্ত নন এবং যেহেতু শুধু রুটির তাগিদেই মরিয়া হওয়া সম্ভব, তাই মরিয়াও এঁরা নন। অথচ আধুনিক বৈশ্য আদর্শে পীড়িত মন এঁদেরও — কারণ এই আদর্শ 'সভ্যতার আনন্দলোককে' ধ্বংস করতে চলেছে।

প্রকৃত মজদুর বোধে পায়ের শিকল ছাড়া তার হারাবার কিছু নেই, অথচ সামনে একটা পুরো পৃথিবী জয় করবার, কিন্তু মধ্যবিত্তের

তা বোঝা সম্ভব নয়। তাই বৈশ্য সভ্যতার অঙ্গীকৃতি প্রোলেটারিটের কাছে রূপ নেয় নিছক বিপ্লবের, এবং মধ্যবিত্তের কাছে রূপ নেয় অন্ততঃ আংশিকভাবে বিদ্রূপের।" [১৫]

সেই মধ্যবিত্ত সুলভ মানসিকতা থেকেই গ্রহণের কবিতাগুলিতে তীব্র ব্যঙ্গ এসেছে।

তখনকার পৃথিবীতে যুদ্ধের যে কালোছায়া পড়েছিল তা থেকেও তিনি দূরে থাকতে পারছিলেন না। অনুভূতিশীল কবি মনের পক্ষে থাকা সম্ভবও ছিল না। তিনি প্রায় সেই সময়েই লেখা -In Defence of the Decadants' সে কথার উল্লেখ করেছেন, —

> In these times of dereliction and dismay, of wars, unemployment and revolutions, the decayed side of things attracts us most. The boredom and the horror, rather them glory of life, is our immediate reality. [১৬]

গ্রহণ কাব্যগ্রন্থের বিষয়ের মধ্যে সামাজিক অবস্থাই প্রাধান্য পেয়েছে এবং সেই সমাজ-নাগরিক। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য প্রবন্ধে সেই স্বীকৃতি সমর সেনকে দিয়েছেন,

> 'সমরের কবিতায় মুক্তির আয়াস নেই। তার কারণ নয় যে সে মুক্ত। সমরের কাব্য গ্রহণ প্রধানতঃ সামাজিক। যার প্রতীক এই কলকাতার জীবনযাত্রা, সেই ব্যর্থতার প্রতিভূ হিসেবে তার কবিতার একত্ব।' [১৭]

॥ চার ॥

সমর সেনের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম 'নানাকথা'। প্রথম প্রকাশকাল - ১৯৪২ সাল। এতে পনেরোটি কবিতা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে কিছু কবিতার সাথে নানাকথা নামটিও বাদ দেওয়া হয়েছে। '১৯৪০ - ১৯৪২' এই সময় সীমায় কবিতাগুলিকে রাখা হয়েছে।

এই সময়ে ভারত এবং বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অগ্নিগর্ভ। বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, ভারত তার থেকে দূরে ছিল না। তাছাড়া অসহযোগ আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, আগস্ট আন্দোলন ইত্যাদির ফলে ভারতের রাজনৈতিক আকাশও ছিল বজ্রগর্ভ। খাদ্য-বস্ত্রের অভাব, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি মিলে এই অবস্থাকে আরো কঠিন করে তুলেছিল। সাধারণ মানুষই এই অবস্থায় বিচলিত বোধ করছিলেন। সুতরাং অনুভূতিশীল কবিমনে তার প্রভাব ছিল আরো সুদূরপ্রসারী। সমর সেন তার ব্যতিক্রম নন।

নানাকথার কবিতাগুলিতে সমাজজীবনের ছাপ গভীরভাবে পড়েছিল। 'কয়েকটি কবিতা' অথবা 'গ্রহণে' সেই অর্থে বৃহত্তর জীবনের ছাপ ছিল না। এইসময় পর্যন্ত তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক ঘটনাবলী তেমনভাবে প্রভাব ফেলে নি। বরং ব্যক্তির নিজস্ব কামনা বাসনা, দুঃখ সংঘাতই ছিল তখনকার কবিতার উৎস। প্রেম পাওয়া অথবা না-পাওয়ার দুঃখ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থানগত ত্রুটি, আত্ম-বিদ্রূপ এবং মুক্তিবাসনা এগুলোও কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তিনি প্রেমের কোন নান্দনিক সৌন্দর্য বা অতীন্দ্র অনুভবকে রূপ দেন নি বরং ছলনা কামুকতা ইত্যাদির কথাই লিখেছেন।

তাঁর চারের দশকের কবিতাগুলিতে এই ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা সরে গিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজজীবন প্রাধান্য বিস্তার করল। এই জীবনের নানা কদর্যতার রূপ তিনি কবিতায় ফোটালেন। সেই সঙ্গে রাজনীতি সচেতনতাও দেখা গেল। তিনি সম্মিলিত শক্তির প্রতি আস্থা পোষণ করলেন।

'নানাকথা'র আলোচনা প্রসঙ্গে মনীন্দ্র রায় কবিতা পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪১ সংখ্যায় লিখেছিলেন —

> এতদিন সমর সেনের কবিতার নায়কগুলিও ছিল প্রায়শ এই শ্রেণীরই প্রতিনিধি। 'কয়েকটি কবিতা' ও 'গ্রহণ' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্যান্য মধ্যবিত্ত পুরুষের মত তারাও দেখি সেখানে হা-হুতাশ করে, মাঝে মাঝে অসহ্য আক্রোশে নিজের গায়েই নিজে দাঁত বিঁধিয়ে দেয়, কিন্তু জানা চাতে কমে না, পথের রেখাও চোখে পড়ে না, কেবল অন্তরে বাইরে বেদনার অন্ধকারই পাথর কঠিন হয়।

তবু আশা যায় না। মনে হয় যেন কোথায় পথ আছে, অলক্ষ্যে কোথায় যেন মন্দ্রধ্বনি মেঘের গুরুগুরু ধ্বনিতে ভাষা খোঁজে, দূর থেকে যেন অগাধ বিস্তারের সমুদ্র গর্জন কানে আসে।

কিন্তু বর্তমান কবিতা পুস্তকে দেখি দৃষ্টিভঙ্গি রীতিমত পৃথক কবির কাব্যাদর্শ এখানে আগেকার বইদুখানির মতো কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবক্ষয় নক্সা চিত্রণেই সীমিত নয়। এখানে কবি চোখ ফিরিয়েছেন প্রথমত: নিজের দিকে, তারপর সমাজের দিকে সাধনা চলছে ব্যষ্টিকে কী করে সমষ্টির মধ্যে বিলীন করা যায়। [১৮]

অর্থাৎ সমর সেনের কবিতায় সামাজিক প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে। আর এই সমাজ কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত সমাজ নয়। নানা শ্রেণীর মানুষ এখানেও ভীড় করেছে।

'নানাকথা'র কবিতাগুলি আকারে দীর্ঘ। এতদিন পর্যন্ত অধিকাংশ ছোট কবিতা তিনি লিখে এসেছেন। নানা কথা থেকে সেই ভঙ্গীতে পরিবর্তন এসেছে–দীর্ঘ ও স্তবকে বিভক্ত কবিতা এখান থেকে লিখেছেন।

'নানাকথা'র প্রথম কবিতা 'রোমন্থন' কবিতাটি দুটি অংশে ভাগ করেছেন। অতীত দিনের স্মৃতি ও ভাবনার ছাপ তিনি কবিতাটিতে ফেলেছেন। নগরবাসী কবির স্মৃতিচারণায় স্বাভাবিক ভাবেই চেনা শহরের ছাপ রয়েছে —

লাল পাগড়ির লাঠির সামনে
(বঙ্কিমী সে লাঠি)
দেশবন্ধু পার্কে এলোমেলো পলায়ন —

'দেশবন্ধুপার্ক' কোলকাতার পরিচিত বিন্দু।

এই কবিতায় স্মৃতিরোমন্থনে তাঁর হাল্কা ব্যঙ্গের ছলে গভীর কথা বলার ভঙ্গীটি লক্ষণীয় —

অনেকের সামনে অনেক বক্তৃতা,
শেষ কি আমাদের দিন,
কেন কানাগলি, ঘরামাঠ, শূন্য গোলাঘর
কেন শেষ আমাদের দিন ?

অনেক অনেক আজগুবি কথা কৈশোরে শুনেছি,
নিরালা কোন কেন্দ্রে
স্বচ্ছন্দ যুগল জীবন যাত্রা,
আদর্শ বলে মেনেছি,
জেনেছি জনগণ বর্বর,
আত্ম-চিন্তাই পরম চর্চা।

দিনশেষের সাথে কানাগলি, মরামাঠ বা শূন্য গোলার তুলনায়, জীবনের আদর্শ — স্বচ্ছন্দ যুগল জীবনযাত্রা বলায় আধুনিক হৃত সর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিক মানুষের ছবি পাওয়া যায়। কৈশোরের অহিংস আন্দোলনকে বিদ্রূপ করা বা সশস্ত্র আন্দোলনকে 'তত্ত্বকথা' বলাতেও কবির শহুরে সংস্কারের ছাপ চোখে পড়ে।

প্রথম যৌবনে যখন প্রেমের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে পরাজয় আসছে সেকথাও জানান ভাবালুতা-শূন্য নির্বিকার চিত্তে —

ইতিমধ্যে ইতস্তত অনেকের মতো
মদন রাজত্বে থেকে বার কয়েক বিতাড়িত।

সেই অবস্থাতেই শুনতে পাচ্ছেন হাওয়ায় উঠেছে দুর্দিনের শব্দ, শোনা যাচ্ছে বিপ্লবের ধ্বনি। কিন্তু কবিতার নিস্পৃহতা বজায় রেখেছেন এখানেও

কল্লোল
সামনে বরাবর কালের জোয়ার,
সাঁতারের শক্তি কি সাহস কিন্তু কখনো ধরি নি।
অবশেষে আজ

অসংখ্য নিরক্ষর দুঃখের দেশে
নিঃসম্বল পর্যটক যাত্র —

কবিতার দ্বিতীয় অংশে রয়েছে তাঁর অকাল বার্ধক্যের কথা। ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্নময় অবস্থা আর বর্তমানের দুঃসময় এই দুয়ে মিলে কবির এই বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করে।

পুত্রকন্যা এখনো আঙুলে গোনা যায়,
বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ,
তবু নিজেকে কতদিনের জীর্ণ বৃদ্ধ লাগে,
জিভে স্বাদ নেই, জানি না
কি পাপে সুস্থ শরীর ঘুণের আশ্রয়।

এখানে তিনি যেন জরাগ্রস্থ। অথচ একসময় বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতাকে 'নবযৌবনের কাব্য' বলে উল্লেখ করেছিলেন। পৃথিবীরূপ থেকে যত তিনি স্বরূপে অগ্রসর হয়েছেন ততই তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, ঘুণ ধরেছে তাঁর দেহ-মনে। সেই বোধ থেকেই তাঁর মনে হয়েছে

নুড় পাহাড়, নুড় বোধ,
শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ।

এই রোমন্থন কবিতায় তিনি নিজের অতীত এবং বর্তমানের যে বিশ্লেষণ করেছেন তা সুস্থ সক্ষম আত্মসমালোচকের পক্ষেই করা সম্ভব।

দ্বিতীয় কবিতা 'হসন্তিক' — কবিতাটি চারটি অংশে বিভক্ত। এই কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলী ট্রাম, ইয়ার, পলিটিক্স, নৈরাজ্য, লালধ্বংস ইত্যাদিতে নগরের গন্ধ রয়েছে। পঙক্তি ব্যবহারেও বিশিষ্ট তীর্যকতা রয়েছে —

প্রেম আমার পরিখা, দম্ভ প্রাকার,

অথবা,

প্রেম ও পলিটিক্সের বিচিত্র গতি
হৃদয় বিষাদে ভরায়।

রাজনৈতিক অবস্থাকে ব্যঙ্গ করতে তিনি ছাড়েন নি —

নৈরাজ্য আর লাল ধ্বংস শুধু।
ভোঁতা বর্শায় কাজ নেই আর,
সম্বল মৌনব্রত, ঈশ্বর, বেনের আশ্রয়।
নেপথ্যে অহরহ আশ্বাসবাণী :
গণতন্ত্র আসন্ন,
সামনে দন্ড হাতে, তারি শিষ্ট দূত,
কয়েকদিনের শান্ত তদারক পরাদের আড়ালে।

গান্ধীজির মৌনব্রত তার প্রবর্তিত পন্থা, কংগ্রেসের গৃহীত নীতি ইত্যাদির প্রসঙ্গে লিখেছেন।

নগরের আগ্রাসী মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন —

ধানক্ষেত জীর্ণ প্রায়
অগণন ধোঁয়ার কণা, চিমনিতে চিরছে আকাশ।

ধানক্ষেতের জীর্ণত্ব প্রাপ্তি, কলের ধোঁয়া বা উঁচিয়ে থাকা চিমনি নগরজীবনের ইঙ্গিত দেয়।

'ব্রতচারী' নামের ছোট কবিতাটিতে কলকাতা যেন তার গন্ধবর্ণ সহ উপস্থিত —

পথেঘাটে রোদ্রের করাল উত্তাপ
নাসারন্ধ্রে দুর্গন্ধ, স্তূপীকৃত জঞ্জাল,
শুনছি ধর্মঘটে করপোরেশন বেহাল,
কলেরা বসন্ত প্লেগের আসন্ন উৎসব।

করপোরেশনের ধর্মঘট রাস্তার জমে ওঠা জঞ্জাল আর তার দুর্গন্ধ আমাদের এই চেনা শহরের অঙ্গ। সমর সেন তাঁর ১৯৪০-এর লেখা কবিতায় যেন আজকের শহরকেই তুলে ধরেছেন।

'সাফাই' কবিতায় সমরবাবু সাঁওতাল পরগণার কথা আবার মনে আনছেন।

সাঁওতাল পাহাড়ে সূর্য ফেলেছে লাল রং,
একদা শালবনে কেটেছে রোমান্টিক দিন,
সাপের ভয় সুন্দর ছিল।

সাঁওতাল পরগণা তাঁর কাছে নাগরিক বশ্যতার হাত থেকে মুক্তির স্থান— তাই নানা কবিতায় ঘুরে ফিরে তিনি সেই স্বপ্নময় দেশের ছবি তুলে ধরেন।

'সারণের গান' কবিতায় দুর্ভিক্ষ আর দুঃস্বপ্ন ভরা সময়ে অসুস্থ মানুষদের কথা বলেছেন। এই মানুষেরা দুর্ভিক্ষের শিকার, তবু এদের দুর্ভিক্ষ অন্নের নয়— মননের, সহজ স্বাভাবিক জীবনের।

দুর্ভিক্ষ লেগেছে দেশে, তাই বর্গিরা বাড়ে,
দুঃস্বপ্নের ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে
শৌখিন সৌন্দর্য দেখি বারে বারে আসে
ধানখেতে, অমসৃণ বিস্তীর্ণ বালির স্তূপে,

কখনো বা আদিগন্ত বৃষ্টির, বন্যার জলে।

* * * * * *

* * * * শুধু দেখি

কুৎসিত মানুষ আর রোগাক্রান্তা নারী,

বক্র, গলিত নাসা,

উৎসবের উচ্ছিষ্ট তন্ন তন্ন খুঁজে

জন্তুজীবী শঙ্কিত কুকুর দিনরাত্রি ঘোরে,

* * * * *

* * * * *

দলে দলে

ঘর ছাড়া নাগরিক যত যাত্রী সমুদ্রতীরে

পরিহাসে, কলরবে বিলোল নরনারীর

সুরায় সংগীতে ব্যভিচারে কাটে অন্তিম সময়,

ক্লীবের সংখ্যা বাড়ে —

দুর্ভিক্ষ তার মধ্যে নিরন্ন মানুষ উচ্ছিষ্ট খুঁজে খাবার খাচ্ছে এই ছবির পাশে আছে সেই সব মানুষের কথা যারা তাদের সময় কাটায় 'সুরায় সংগীতে ব্যভিচারে'। কবি বলেছেন এই সব মানুষেরা নাগরিক। এদের অন্তর মনুষ্যত্বহীন ক্লীবের মতো।

'খোঁয়াবী' কবিতায় সমর সেন দিল্লীর উল্লেখ করেছেন। এতদিন পর্যন্ত তাঁর কবিতায় কোলকাতা শহরের কথাই বেশী দেখতে পাওয়া গেছে; চাকরীসূত্রে যখন তিনি দিল্লীর বাসিন্দা হলেন তখন সেই শহরের কথাও কবিতায় আনলেন।

সূর্য ওঠে কুয়াশা ছিঁড়ে, মিনার জ্বলে,
আবার শুরু হয় নগরের প্রাণ।

অথবা,

শ্বেতপাথরে সূর্যের আলো লাগে,
নবাবী আমল, শৌখিন প্রাণ,
সন্ধ্যায় নামে মসজিদে আজানে
কানে বাজে কান রাতের গান

এইসব পঙক্তি প্রাচীন শহরটির রূপ ফুটিয়ে তোলে। কুয়াশা ভেদ করে মিনারের চূড়ায় সূর্যের আলো পড়া বা শ্বেতপাথরের প্রাসাদের গায়ে সূর্যের আলো লাগা, সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে মসজিদের আজানের শব্দ ভেসে আসার মধ্য দিয়ে প্রাচীন দিনের নগরের এক ছবি যেন জেগে ওঠে। এই প্রাচীন শহরটির রূপ তিনি আরো বর্ণনা করছেন —

ভাঙা পাথর মাইলের পর মাইল
জরাগ্রস্ত মসজিদ, মন্দির, মোগলাই দুর্গ,
দিনে প্রাচীন বিষণ্ণ গর্বে কঠিন,
অন্ধকারে অবাস্তব,

দিনের বেলায় এই শহরটি প্রাচীন আর বিষন্ন হয়ে থাকে তার ভাঙা চোরা মন্দির - মসজিদ দুর্গ নিয়ে রাতে অন্ধকারে একে অবাস্তব বলে মনে হয়। মনে হয় যেন একটি প্রাচীন পশু শীতে স্তব্ধ হয়ে আছে আর তার পাশে নতুন কাল শেয়ালের মত ডাকাডাকি করছে। তাই শহরের এই প্রাচীন রূপে

উজ্জীবনের উৎস নেই
এ গাম্ভীর্য সমাহিত শান্তির নয়,
অবক্ষয়ের উচ্ছিষ্ট মাত্র।

একদিন এর ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। মরুভূমির ভয়াল ঝড়ের সন্তর্পণে চলা উটের মত এই প্রাচীন নগর চলছে।

মরুভূমির আলোড়িত ভয়াল ঝড়ে,
এ প্রাচীন নগরে
ঊর্ধ্বগ্রীব উট সন্তর্পণে চলে,
দিগ্বিজয়ী মদন শহরে নরক জ্বালে।

'শবযাত্রা' দীর্ঘ কবিতা নয়টি অংশে বিভক্ত। দিনের পর রাতে যতই অবশ্যম্ভাবী জন্ম ও মৃত্যু। মৃত্যুর কথা কবিতাটিতে বার বার এসেছে। তেমনি শহর, শহরের রূপও কবিতাটিতে ফিরে ফিরে এসেছে।

কবিতার প্রথম অংশে বলেছেন —

কঙ্কাল গাছ হাতছানি দেয়,
প্রখর রৌদ্রে
মরুভূমি আমাদের ঘেরে;
রাত্রি স্বস্তি আনে না,
গুমোট শহর অতীত পাপের পুনরাবৃত্তি রচে।

কঙ্কাল গাছ, প্রখর রৌদ্র, মরুভূমির সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে অতীত শহরের কথা। শহরের প্রাচীনতা, শুষ্কতা বোঝানোর জন্যই যেন তুলনাগুলি এনেছেন। এই শহর সম্ভবতঃ দিল্লী কারণ 'অতীত পাপ' বা পরের অংশে 'দিনশেষের আজান' থেকে সেই কথাই মনে হয়।

চতুর্থ অংশে আবার বলছেন 'প্রাণহীন নগরের ধারে' ফসল ঝরানো মাঠ ধূ ধূ করে, তাই রাতই ভাল এই নগরের। তখন নবাবী আমল যেন ভেসে ওঠে। পেয়ালার শব্দ, পাখোয়াজের বোল, সুরার মত মাদকতা ভরা গানও

যেন ভেসে আসে।

ষষ্ঠ অংশে গ্রামের কথা জানাচ্ছেন। সেখানেও অবস্থা ভাল নয় কিন্তু নতুন কালের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শহর ছেড়ে চলি অনেক দূরের গ্রামে।
সেখানে দেখি, তুখোড় মহাজন,
তার তৃতীয় নয়নের সামনে
জীর্ণ বলদে চষা মাঠে সোনালি ফসল ফলে না,
দিনে দিনে পশ্চিমের যুদ্ধ শক্তিশেল হানে।
তাই অনেক কিষাণ আজ জমায়েত, সরবে হাঁকে —
'লাঙল যার জমি তার।'

কেবলমাত্র নগরের প্রান্তেই ফসল ঝরানো মাঠ নয়, গ্রামেও ফসল নেই। যুদ্ধ, মহাজনের অত্যাচার সব মিলিয়ে মানুষ নতুন দাবী তুলেছে 'লাঙল যার জমি তার'— বৃদ্ধ চাষীরা এইসব ব্যাপারে উদ্ভ্রান্ত। বিপ্লবের এই চেষ্টায় কবি যেন আশান্বিত। কিন্তু পরের অংশেই তাঁর সেই আশা আকাশ-কুসুমে পর্যবসিত হয়েছে। বিরোধী স্বার্থের হীন সন্ধিতে চক্রান্ত ঘনিয়ে আসে। বিপ্লব-স্লোগান- স্বদেশী গান সবই ব্যর্থ হবে। কিছু মানুষ মরবে, কিছু পঙ্গু হবে— বিপ্লবের চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

অষ্টম ও নবম অংশে এই হতাশাকেই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মনে হচ্ছে মানুষের হৃদয় যেন সংকীর্ণ গলি। এই ঘোঁয়াটে শহরকে চকিত বসন্তের বাতাস আর আলোড়িত করবে না। দিনরাত্রি আকাশের মুখ বন্ধ করে রাখবে ধুলা।

'নগরের কোলাহল ক্রমশ কমে গেল' — সেই স্তব্ধতায় মাঝে শোনা যায় মুমূর্ষু মানুষের শব্দ। অন্ধকারে অন্ধকার জীবীরা কালো টাকা গোনে আর শবযাত্রাধ্বনি শোনা যায়।

কবিতাটি নগরের প্রেক্ষাপটে রেখে লিখেছেন। যুদ্ধ এবং চক্রান্ত মানুষকে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে এই অবস্থায় মৃত্যু অথবা মুমূর্ষুর মত বাঁচাই মানুষের নিয়তি। গ্রামের প্রসঙ্গ তিনি একবার এনেছেন কিন্তু এই গ্রামও শোষণে অত্যাচারে শহরের মতই অগ্নিগর্ভ।

'নানাকথা'র অন্যান্য কবিতাগুলিতে (পরিস্থিতি, কয়েকটি মৃত্যু, ঘরে বাইরে, নানাকথা, পঞ্চ প্রবাহিনী, বসন্ত, নববর্ষের প্রস্তাব) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে আমাদের দেশ ও বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন। কংগ্রেস এবং কম্যুনিস্ট পার্টির নানা সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন সুভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গশ্রবণ মন্তব্য। দেশের সাধারণ মানুষ এবং মধ্যবিত্ত সমাজের ভাবনাচিন্তাকেও তিনি কবিতায় তুলে ধরেছেন।

'পরিস্থিতি' কবিতায় পশ্চিমের যুদ্ধে আমাদের দেশের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন,

মন্দির মসজিদ গির্জায় শোনা যায় উচ্চকিত আর্তস্বর
ঐক্যতান, কুরুক্ষেত্রে পুরুষবিলাপ।
এদিকে তাই দেশ রক্ষায় বিপ্লবী নেতা হঠাৎ তৎপর,
ফলে উচ্ছ্বসিত ভারতবন্ধু,
ধামাধরায় অক্লান্ত নব্য 'বলশেভিক' সাঙ্গপাঙ্গ
পার্শ্বচর আস্ফালনে মুখর,

এপ্রিলে যে সংগ্রাম শুরু, এ্যাসেমব্লি হলে হবে শেষ
এ হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে অনেক পার্টির চিত্ত।

যুদ্ধকে দোরগোড়ায় নিয়ে প্রার্থনা করার মত কাজকে যেমন তাঁর ভন্ডামী বলে মনে হয়েছে তেমনি দেশের শত্রু ইংরেজ হঠাৎ বন্ধু হয়ে ওঠাটাও তিনি বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। সমর সেন যেন অনুভব করছিলেন বর্ণহীন শহরে রক্তবর্ণ কৃষ্ণচূড়া ফোটার মতই ভারতের ভাগ্যাকাশে কোন এক ঝড় ঘনিয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় রোমান্টিক গান গাওয়া উচিত নয় —

যদিচ বেকার, নিঃসঙ্গ, মনে মনে প্রেমিক,
তথাপি বামপন্থী পত্রিকায়
আসন্ন বিপ্লবের গান অবশ্য উচিত।

দিনে দিনে প্রতিপন্ন হয় আমাদের প্রয়োজন নেই
স্বাধীনতায়। কারণ, জর্মান আমলে সকলি মায়া।
সংসারকে তুড়ি মারি, একমাত্র ভয় —
মেঘদূতী বিমান যদি বজ্রহানে ?

বামপন্থী কবি সমর সেন এখানে আত্ম সমালোচনা করতে ভয় পাচ্ছেন না। জার্মান আমলে স্বাধীনতা নিষ্প্রয়োজন অথবা বামপন্থী পত্রিকায় বিপ্লবের গান গাওয়া উচিত ইত্যাদি কৌতকপ্রবণ উক্তির মধ্য দিয়ে তিনি তা করছেন। এই সমালোচনা করার মানসিকতা নিঃসন্দেহে একজন যথার্থ বামপন্থীর মতো কাজ।

কয়েকটি মৃত্যু' কবিতায় মানুষের মনের যান্ত্রিক দিকটি তুলে ধরেছেন। আত্মসুখ পরায়ণ মানুষ নিজের জন্যই দুঃখবোধ করে, নিজের

অবস্থানগত অসুবিধাটিই তার কাছে হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র চিন্তার বিষয়।

কবিতার প্রথম অংশের বৃদ্ধটির দাম্পত্য জীবনের ছবিতে নগ্ন স্বার্থপরতা আছে —

প্রেমের ব্যাপারে দিব্যি বেপরোয়া,
সরম নেই।
আর একটি গুণ
ছেলে পিলে চায় না মোটেই।
পুন্নামের মুখে মস্ত তুড়ি মেরে
স্বচ্ছন্দে চলে যায় দাম্পত্য জীবন।

অবশেষে বুড়ি হয়ে এই দাম্পত্য জীবনে ছেদ পড়ল। এখনো সঙ্গীহীন বৃদ্ধটি তার এতদিনের সঙ্গীর কথা ভাবছে না – ভাবছে নিজের একাকীত্বের কথা। আপশোষ করছে সমাজ বদলেছে, দ্বিতীয়বার বিয়ে করার সুযোগ নেই বলে। যে এতদিন পুন্নামের মুখে তুড়ি মেরে দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছে সেই এখন সমাজ বদলানোতে দুখ পাচ্ছে। এই স্বার্থপর সুবিধাবাদী ভাবনা চরিত্রটির স্বরূপ বোঝায়।

দ্বিতীয় মৃত্যুটি কবির বন্ধুর। স্মৃতিতে ভেসে আসছে চায়ের দোকানের আড্ডা, ধার নেওয়া, বই চুরি করা ইত্যাদির কথা। মড়া পোড়ানোর ধোঁয়ায় মনে পড়ছে ভবিষ্যতের ছবি–বন্ধুটি কিভাবে বলেছিল। তারপর চায়ের দোকানে বসে কবির বোধদয় হন —

আজকাল ঘরে ঘরে সমাজধার্মিক অনেক,
মুখে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বুলি,
মনে রোমান্টিক বুলবুলের অবিরত গান,

তুমি ছিলে তারি একজন,
এ অধমও তারি একজন।

সুতরাং শোক বৃথা; মরে তুমি হয়ত বেঁচেছ
আমরা বাঁচি নি ---

বন্ধুর এবং নিজের চরিত্রের বিশ্লেষণে যেমন সহজ বুদ্ধির ছাপ মেলে তেমনি 'মরে বাঁচার' ভাবনাতেও কবির আধুনিক মনের পরিচয় স্পষ্ট হয়। বিসদৃশ জীবন ভাবনা নিয়ে দিন কাটানোর চাইতে, ক্রমশ এগিয়ে আসা দুর্দিনের হাত এড়ানোর জন্য মৃত্যুই শ্রেয়।

'ঘরে বাইরে' কবিতাটি চারটি অংশ-'প্রেম ও পলিটিক্স' 'স্থানীয় ফ্লাড রিলিফ' 'আন্তর্জাতিক : ধর্মের গ্লানি' 'প্রাকৃতিক: একটি রাত্রি'- এই চারটি অংশে বিভক্ত। নামের মতই বিষয়ের ক্ষেত্রেও একটা ঋজু ভাবনা রয়েছে।

প্রেম ও পলিটিকস অনেকটা সমার্থক করে কবি দেখেছেন। প্রেম অথবা পলিটিকস সারল্যের আড়ালে ধূর্ততা, তাই তিনি চান 'পৃথিবীর বদরক্ত বের হোক / অস্ত্রোপচার নিতান্ত প্রয়োজন।'

দ্বিতীয় অংশে পান্ডব বর্জিত দেশে মন্ত্রীর আগমনে ---

সকালে বৃষ্টি বিকেলে মন্ত্রী
হাট নষ্ট।

অল্প কথা কিন্তু এই সব হুজুগ মানুষ কিভাবে নেয় তা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন ---

দলে দলে তাই চলেছি সভায়
দেখি আগন্তুক মন্ত্রী কি করেন।
কী যেন খেয়ে তাঁর ঘোরতর অম্বল, রক্তবর্ণ মুখ,
তাই স্বল্পভাষী, বিজয়ী প্রসাদে গেলেন ফিরে;
যাতায়াতী খরচ যত
পৈত্রিক রসদ তত কঠিন তরল,
শত্রুপক্ষ নানা কথা বলে।

এই মন্ত্রীর আগমন, তা নিয়ে মানুষের কৌতূহল অথবা রচনা সবই যেন বর্তমান সমাজের ছায়াছবি।

তৃতীয় অঙ্কে যুদ্ধে আক্রান্ত পৃথিবীর কথা বলেছেন, কত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, কত মানুষ বন্দী হয়েছে তাদের জন্য কবি দুঃখবোধ করেছেন। ব্যঙ্গোক্তি করেছেন রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচেতনা, ধর্মচেতনাকে —

পরম মানুষ সে যে, থাকে নিশ্চিন্ত দূরে,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে চলে তাঁরি ধর্ম সংগ্রাম
সত্য নিহত প্রথম আক্রমণে।

রবীন্দ্রদর্শনের প্রতি, ধর্মের প্রতি বা বিশ্বাসের প্রতি সমর সেন বা তখনকার অন্যান্য কবিদের বিরূপতা ছিল লক্ষণীয়। এই বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহে আধুনিক। ধূর্জটি প্রসাদ লিখেছিলেন —

'বিষ্ণু দে, সমর সেন ও চঞ্চল কুমারের অধিকাংশ কবিতাতে অন্যান্য কবিদের, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের পদের উদ্ধৃতি আছে, এবং সেগুলো সম্পূর্ণ নতুন ধরণের পদের সঙ্গে গলাগলি করে দাঁড়িয়ে থাকে। উদ্দেশ্য অবশ্য নতুন পুরাতনের বৈপরীত্য বোধ জাগান। উদ্ধারটা স্মৃতির এবং বোধ জাগান

চেতনার কাজ। দুটি কাজের সমন্বয়সাধন, দুই রাজ্যের অবাধ বিচরণ আজকালকার স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি অতএব কাব্য প্রয়াসের অধীন। আধুনিক কবিতাতে সমসাময়িক হতেই হবে। কিন্তু সমন্বয়ে এমন একটা কিছু থাকে যেটা নিছক দ্বন্দ্বের (Contrariety) অতিরিক্ত।[১১]

সমর সেনের ক্ষেত্রে দেখা যায়-কবিতার নামে, কখনো পঙক্তি উদ্ধারে, কখনো ভাবের বৈপরীত্য বোঝাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক উদ্ধার করেছেন। এখানেও কবিতার নাম, আন্তর্জাতিক ধর্মের গ্লানি বলে শীর্ষনাম, পরম মানুষ, ধর্মসংগ্রাম, সত্য-নিহিত ইত্যাদির ব্যবহার একান্তই রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিনি আধুনিক তা বোঝানোর চেষ্টা।

'নানা কথা'ও একটি দীর্ঘ কবিতা। এখানেও যুদ্ধ তাতে রাশিয়া জার্মান ও অন্যান্য দেশের ভূমিকা এবং ভারতবর্ষের অবস্থার বর্ণনা করেছেন। তারই মাঝে কখনো এসেছে কবির একান্ত অনুভূতির খবর।

কবিতার প্রথম অংশে জার্মানের রাশিয়া আক্রমণ এবং এতদিন পর্যন্ত সেই কাজে ইউরোপের অন্যান্য দেশের মদত জোগানোয় তিনি স্পষ্টই গালাগাল করছেন ——

দুযুগ গত,
রক্ত আশ্বিনে রুশ বিপ্লবের পর
মধ্য ইউরোপে
জারজ সন্তানকে সংগোপনে রসদ জোগায়
মাতা তার, দাঁত চাপা বৃদ্ধা গণিকা,
পশ্চিমী গণতন্ত্র নাম॥

জার্মান শক্তিকে জারজ সন্তান বা মার্কিনকে দাঁত চাপা বৃদ্ধা গণিকা বলার মধ্য দিয়ে কবির ক্রোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এই যুদ্ধ শুধু ইউরোপের দেশগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয় তা সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করছে। আমাদের দেশেও গ্রাম-শহর নির্বিশেষে ক্ষতি করে চলেছে। গ্রামের 'শস্যহীন মাঠে পোড়া বারুদের' গন্ধ যেমন জাগছে তেমনি শহরেও

তিলে তিলে গড়া কারখানার ভগ্নাংশ মাত্র
শহরে জাগে
বিগত দিনের কঙ্কাল।

অসৎ সময় আর অত্যাচারে অনাচারে সমুদ্রা মেখলা পৃথিবী ছিন্নভিন্ন। বিদেশীরা আজ দেশের 'উপপতি' সাজে। আকাশ চিমনির ধোঁয়ায় কালো হয়। মানুষের মৃত্যুতে পৃথিবী ক্রমশ যেন মরুভূমি হয়ে ওঠে। কবিতার শেষ অংশে তিনি আশা করছেন অত্যাচার শেষ হবে, পৃথিবীতে নূতন দিন আসবে।

....সক্রিয় আশা মৃত্যুহীন জাগে অনেকের মনে,
অপরের শস্যলোভী, পরজীবী পঙ্গপাল
পিষ্ট হবে হাতুড়িতে, ছিন্ন হবে কাস্তেতে।

কবিতার গভীর ভাবনার সাথে হাল্কা চালে তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্ন সাধের কথাও বলেছেন। বলেছেন-আশা করেছিলেন মনের মত সঙ্গিনী, কিছু টাকা আর দুচারটে ছেলেপুলে নিয়ে সুখে দিন কাটাবেন। কিন্তু সেখানেও বয়স হলে বাতে ধরে, শ্লেষ্মায় ঘুম ভাঙে, এক সময়ে আসে নিশ্চিত মৃত্যু। অথবা বলছেন, —

এ লক্ষ্মীছাড়া দেশ ছাড়ুন মশাই
ব্যক্তিত্বের মৃত্যু এখানে।

কখনোবা মহুয়া বনের কথা মনে পড়ছে, মনে হচ্ছে তিনি যেন কলে পড়া ইঁদুর আবার বলেছেন,

শ্রাবণের কলকাতায়
অনেক মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায়,
আজ ২২শে শ্রাবণ।

শ্রাবণের কলকাতায় শুধু বাইশে শ্রাবণের কথাই বলছেন না — বলছেন 'মহৎ লোকসান লোকে সুচ্ছন্দে ভোলে।' কাংস্য ভাষী কেরানিরা ছাত্ররা ভুলনেও সমর সেন এই লোকসান ভুলতে পারছেন না। —এগুলি কবির ব্যক্তি-গত অনুভব।

পঞ্চম বাহিনী কবিতাটিতে অতি সাধারণ মানুষের মুখের কথা, তাদের স্বদেশ ভাবনা তিনি ঠিক তাদের মত করেই তাদের ভাষায় তুলে ধরেছেন আর তা কবিতাও হয়ে উঠেছে। কবিতাটি যে স্থান বিশেষের তা দিল্লীর কারণ বলছেন —

শহরে ফিরে এল আদিম অন্ধকার
চাঁদনিচকে শিস দেয় এ. আর. পি সর্দার।

অন্ধকারের মধ্যে তিনি শোনেন বুড়ো মজুর তার সঙ্গীকে বলছে —

..... হামারা হিন্দুস্থান নেহি দেসে।
হিম্মৎ হ্যায়, জানোয়ার মারনেকো লিয়ে, মরনেকো লিয়ে তৈয়ার,
ভাই আনোয়ার, হাতিয়ার চাহিয়ে, তেজ হাতিয়ার।
হিন্দুস্থানকী ইজ্জৎ বাঁচ্ নেহি সেকতি ইয়ে কালা বুরখায়
ব্ল্যাকআউট তো বিলকুল মজবুরীকা বাত হ্যায় —

তারপরেই আনোয়ারের ভাবনাও কবি বন্ধুর আপন ভাষাতেই তুলে ধরেছেন —সে বলছে – ইংরেজ চলে যাবে হিম্মৎ-এর প্রয়োজন নেই —

..... হাজারো সিপাই সাথ্
বংলার শের আনেওয়ালে হিন্দুস্থানমে,
উনকে সাথ আজাদী আনেওয়ালী হিন্দুস্থানমে

বুড়ো মজুর বা আনোয়ার দুজনেই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে দুভাবে। এই অংশে পুরো হিন্দী সংলাপ তুলে দিয়েছেন। এতে মজুরের মুখের কথা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় অংশে বলছেন মাংসলোভী শকুনেরা ছায়া ফেলেছে আমাদের দেশে। শত্রুকে চিনে ওঠাই শক্ত। এখানে সুভাষচন্দ্রের প্রতি একটু বিদ্রূপ প্রকাশ করেছেন —

এঘোর রজনীমেঘের ঘটা,
কী করে আসবে বাটে
দূর বার্লিনে বঁধুয়া তিতিছে,
বেতারে শুনে পরাণ ফাটে।

সাধারণ মানুষের কাছে নেতাজী বীর হিসাবে পূজা পেয়েছেন। কিন্তু ইংরেজ শক্তি, কম্যুনিস্ট দল এবং কংগ্রেসও তাঁকে দেশের শত্রু বলেই মনে করত। তাই আনোয়ারের 'বংলার শের'কে নাগরিক কবি সমর সেন বিদ্রূপ করছেন।

তৃতীয় অংশে তিনি বাঙালী হিসাবে আত্মসমালোচনা করছেন।

আমরা বাঙালি, মীরজাফরী অতীত, মেকলের শিক্ষাপ্রাপ্ত
বিষবৃক্ষের ফল।

আমাদের রক্তে বিশ্বাসঘাতকতা আর আত্মম্ভরিতার বিষ মেশানো বলে কবির বিশ্বাস। অতীত এবং বর্তমানের শিক্ষায় আমরা স্বার্থপর, সুবিধাবাদী। তাই কখনো 'বিনিদ্র রাতে নগরের স্তব্ধতায়' তিনি ভেবেছেন এই বিষবৃক্ষের শেষ হোক এখানেই — আগামী দিন হোক কলঙ্কশূন্য —

আগামীকাল আসুক ঘর-ফিরতি মজুরের গানে
কুমারীর আত্মদানের প্রথম বেদনায়
নবজাত শিশুর সহজ কান্নায়;
শতাব্দীর যন্ত্রণার পর
নতুন দিন আসুক সভ্যতার চরম চিতশুদ্ধিতে।

কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। পাতি কেরানির ঘরে মীরজাফরী বদরক্তের ধারা বয়ে চলে।

এই আত্মসমালোচনা আধুনিক মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব।

'বসন্ত' এবং 'নববর্ষের প্রস্তাব' কবিতায় দু'একটি পঙক্তি নাগরিক ব্যঙ্গপ্রিয়তা ও শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। বসন্ত কবিতায় মহাত্মা গান্ধী প্রসঙ্গে বলেছেন —

মহাত্মা স্তব্ধপ্রায়, ওয়ার্ধায় উর্ধ্ববাহু,
এদিকে আসর জমায় অন্যান্য বেনিয়ার দল।

'নববর্ষের প্রস্তাবে তিনি 'ঘুমাট কুয়াশা শহরে'— এই বলে শহরের উল্লেখ করেছেন।

নানা কথার কবিতাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুগ বিশ্বরাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, এইসবের ফলে মানুষের জীবনে ঘনিয়ে আসা দুঃখ দুর্দশা ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি সার্বজনীন হলেও এগুলি নিয়ে কবিতা লেখা নাগরিক মানুষের পক্ষেই সম্ভব। কারণ চোখের সামনে ঘটা ঘটনার বিশ্লেষণ, দূরের সংঘটিত ঘটনার বিবরণ তৎক্ষণাৎ জানা তাদের পক্ষেই সম্ভব। এই ঘটনার বিচারেও নাগরিক বুদ্ধি বিচারের প্রশ্ন আসে। তাছাড়া গ্রামগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা তত ভাল নয়-ফলে তাদের বিচ্ছিন্নতার সুযোগে অনেক ঘটনা ঘটে যায়। তাই এই ধরণের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লেখা কবিতা নাগরিক সুলভ॥

।। পাঁচ ।।

'খোলা চিঠি' সমর সেনের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। মাত্র সাতটি কবিতা নিয়ে ১৯৪৩ সালে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। 'সমর সেনের কবিতায়' খোলা চিঠির কবিতাগুলি ১৯৪২ - ৪৩ এই সময় সীমায় সংকলিত হয়েছে। কাব্যগ্রন্থের নাম নেই।

'নানাকথা' কাব্যগ্রন্থ থেকেই সমর সেনের কবিতায় ব্যক্তিগত অনুভবের জগতের চাইতে সমষ্টিগত অনুভব বড় হয়ে দেখা দিচ্ছিল। সমাজের ক্ষিষ্ণু অবস্থার পেছনে যেসব কারণ আছে অথবা এই অবস্থা পেরুনোর জন্য যে সংগ্রাম সমাজে সংঘটিত হয়েছিল তাই তিনি কবিতার বিষয় করে তুলছিলেন। সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত, রাজনীতির কুটিল আবর্ত এবং মধ্যবিত্ত দোলাচলবৃত্তি এই সবও রয়েছে। তখনকার সমাজ ও রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এইসব বিষয়ের কবিতার বিষয় হওয়া অভাবনীয় তো নয়ই বরং অবশ্যম্ভাবী।

এই সব বিষয়ের সঙ্গে তাঁর নাগরিক মানসিকতারও উপস্থিতি ছিল তাই এক্ষেত্রে বিচার্য। প্রথমেই বলা দরকার সমসাময়িক যেসব বিষয় তিনি কবিতার বিষয়ভুক্ত করেছেন তা তাঁর বিশেষ মানসিকতার পরিচয়ই বহন করে। কারণ পল্লীপ্রকৃতির কবিতা বা পল্লীপ্রেমের কবিতায় এই ধরণের বিষয়ের স্থান পাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে তা আর পল্লীর কবিতা হয়ে থাকবে না। 'খোলা-চিঠির কিছু কিছু কবিতায় তিনি যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন '২২শে জুন কবিতা ----

আমাদের পাড়ায় প্রায় শুনি বলো হরি হরি বোল
এক একটি লোক ইহলোক ছাড়ে।

ঘুম ভেঙে প্রতিকায় পড়ি : প্রবল আক্রমণে,
সশস্ত্র মোরগোলে মৃত্যুর কলরোল,
প্রাণপণে লড়ে পাথুরে সেভাস্টোপোল।
কৃষ্ণসাগরে ছায়া পড়ে, কারখভে, লিবিয়ায়
বিষাক্ত বিছের দুটি দাঁড়া নড়ে।

'খোলা চিঠি' কবিতায়ও হিটলার, যুদ্ধ এবং পুঁজিবাদের প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে।

আজ ছিন্নভিন্ন প্রাণ পলাশ, রক্তকরবী, অন্ধকার সূর্যের ধ্বনি
ধ্বনি প্রতিধ্বনি
হিটলারি বর্গীর নামে ইউরোপের মুখে নামে করাল ঘৃণার
ছায়া
এদিকে ওদিকে হঠাৎ আক্রমণে নরঘাতকের শবদেহ জমে ;
শীত শেষ, ১৯৪২ সালে মহাযোধা বসন্ত এল,
এ-বসন্ত কাদের ? লক্ষ লালসৈন্য অগ্রসর বলিষ্ঠ জয়গানে
রক্তলোভী বন্য সৈন্য হত হয় অক্লান্ত অভিমানে,
উদয় সূর্যের দেশ প্রাচ্যে ছায়া ফেলে, লড়ে বীর চীনে
নির্ভয় সজ্জনে।
অসংখ্য বর্গির গোরস্থানে
পুঁজিবাদ চূর্ণ হবে সারা দুনিয়ায়, লুপ্ত হবে এ হিংদস্থানে

রাশিয়া এবং চীনের সংগ্রামের প্রতি তাঁর আন্তরিক সমর্থন এইসব কবিতায় ধরা যায়। তিনি যেন এখন কমিউনিস্ট পার্টির একজন সমর্থক হয়ে কবিতা লিখছেন। সমর সেনের কবিতায় সচরাচর একটা নিরাশা বা পরাজয়ের ভাব ফুটে ওঠে কিন্তু এই সব কবিতায় কখনো কখনো তিনি সম্মিলিত শক্তির জয় হবে এমন ভাবও

প্রকাশ করেছেন। 'জাতীয় সংকট' কবিতায় —

বিপ্লবী চেতনার সেতুতে
সংকীর্ণ করো এ দুস্তর ব্যবধান,
তোমার অখণ্ড সত্তায় দাও অধিকার,
এ প্রার্থনা আমার।

অথবা 'ইতিহাস' কবিতায় —

হঠাৎ সূর্য ওঠে, বল্লিষ্ঠ প্রহারে
কুয়াশায় নদীর জল ঝলকায়, শাণিত হাতিয়ার।
মাঝে মাঝে বালুচর, কাদাখোঁচা জলে নামে,
ধান ক্ষেতে কাস্তে হাতে কিষাণ,
হাতুড়ি বাজে কামারশালে,
সবুজ আগুন জ্বলে অনেক মাঠে।

এই কবিতাগুলিতে সমর সেন শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের ওপরে গভীর আস্থা পোষণ করেছেন। বাংলার পল্লীকবি যাঁরা তাঁদের কবিতায় জীবনের দুঃখ-সুখের কথা থাকলেও এক শান্ত জীবন ভাবনাও কাজ করে। তাছাড়া তাঁদের কবিতায় কখনোই যুদ্ধ, পুঁজিবাদ, হিটলার ইত্যাদি বিষয় আসে নি। অবশ্য 'বর্গির' কথা আমাদের ছড়ায় আছে —

খোকা ঘুমুল, পাড়া জুড়াল।
বর্গি এল দেশে।।

আধুনিক কালের অত্যাচারী বর্গি হিটলার তার উল্লেখ সমর সেন করেছেন 'হিটলারী বর্গি' বলে। পল্লী কবিতার কাছে এইটুকুই তাঁর ঋণ। সুখ লালিত

গ্রাম্য জীবন নয়— বাস্তব কঠিন এইসব ঘটনার ছবি ফুটিয়ে তোলাই কবির একমাত্র কাজ।

সরাসরি নাগরিক জীবনের ছবি এই বইটির কবিতায় খুব একটা ফুটে না উঠলেও কিছু কিছু আছে। যেমন 'পোড়ামাটি' কবিতায় পুরোনো দিল্লীর কথা বলেছেন —

শতাব্দীর কাল সন্ধ্যায় দিল্লীর শ্মশান স্তব্ধতায়
বারে বারে মনে পড়ে ঃ চারিদিকে ধূ ধূ মাঠ, অনেকদিন
বন্ধ আবাদ,
ধ্বংস সাম্রাজ্যের ভয়াল সমারোহে জাগে তুগলকাবাদ।

এখানে যে দিল্লীর উল্লেখ তিনি করছেন নিঃসন্দেহে তা গ্রাম নয়, সেই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে এই দিল্লী যুদ্ধ আর ধ্বংসে মৃতপ্রায়।

'একটি শহর' কবিতায়ও তিনি শহরের কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত: বলা দরকার 'সমর সেনের কবিতায়' তিনি কবিতাটির নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন 'স্টালিনগ্রাড'। এই নাম পরিবর্তন নির্বিশেষ শহরকে বিশেষিত করেছে। যাইহোক এখানে এই কাব্য সংকলনে তিনি কোন একটি শহরের কথা বলেছেন যে শহর প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।

গভীর রাতে অনেক লোক জাগে,
বিপুল বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর
হৃৎপিণ্ডে এখনো গরীয়ান
কত বর্বরের গোরস্থান এ শহরে

রাতে ভয়ংকর মৃত্যুর মুখে জীবনের জয়গান বাজে,
দূরে নদীর ওপারে হঠাৎ ফেউ ডাকে হুঁশিয়ার।

এখানে অবশ্য তিনি শহরের কেবল ধ্বংসের ছবি দেখছেন না, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও যেখানে জীবনের গান বেজে ওঠে, যে শহর মৃত্যুকে প্রতিহত করতে পারে, তারই কথা বলেছেন।

'খোলা চিঠি' কবিতায় আবার তিনি ফিরছেন কোলকাতা শহরে।

সুন্দর প্রভাত, ডায়মণ্ডহারবার থেকে বোড়ো হাওয়া আসে,
দিনরাত্রি আলোড়িত করে জনতার সফর, আমাদের শহর,
বিমানঘাঁটিতে হঠাৎ হাজিরা দেয়, এখনো পড়েনি বাজ,
চলে কুচকাওয়াজ,
নিরপেক্ষ শূন্যে ঘোরে মজাদার হাওয়াই জাহাজ।

শহরের ভীড়কে মনে করছেন 'জনতার সফর' অথবা বোম না পড়ায় খানিকটা কৌতুকের সুরে বলছেন 'মজাদার হাওয়াই জাহাজ'। এই কবিতারই অন্য পঙক্তিতে ব্যবসায়ীদের পরজীবী বলে ব্যঙ্গ করছেন। সেই সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য নির্ভর করেছেন শ্রমিক শ্রেণীর ওপর।

মুষ্টিমেয় বেনে, আর মধ্যবিত্ত, পরজীবী, শেঠির দালাল,
যদি ক্ষীত স্বার্থের স্নায়ুতে
মনের অন্ধকারে, বামনবুদ্ধির ভ্রান্তিতে ঘোরে
কূপমণ্ডুকের মতো, যদি ভাবে মীরজাফরী জিন্দগী মন্দ কী,
ডাকে কুমির, কাটে খাল, যদি বলে, স্বাধীনতা তেরী মাল,
ও চিজ এদেশে আনবে ভদ্রলোক নন্দদুলাল,

কুরুক্ষেত্রে ক্লীবের পন্থা ধরো,
যদি চায় হিন্দুস্থান লোলুপ জাপান
তবে জবাব তাদের হাতে, এ-দেশ যাদের,
যারা লাঙলে তিলে তিলে সোনা ফলায়,
অন্নের প্রাণের কাঙাল,
নয়ানাভিরাম নীল মেঘ দেখে যারা ফসলের দিন গোনে,
কারখানার কলে যারা দধীচির হাড়ে সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে
শহরে শহরে।
দেশে বিদেশে, বন্যার মুখে জাঙাল বেঁধে,
তারা বলে, দুনিয়ার দুশমনের প্রতিরোধে
দুনিয়াকো কিষাণ মজদুর মজদুর কিষাণ এক হো।

এখানে একই সঙ্গে কবির উপহাস এবং ভালবাসার প্রকাশ ঘটেছে। কবির এই ভঙ্গী নিঃসন্দেহে তাঁর বুদ্ধিজীবী মনের পরিচয় দেয়। বাংলার প্রবাদগুলোকে তিনি একটু ঘুরিয়ে ব্যবহার করেছেন। (যেমন কুঁয়োর ব্যাঙ' বা খাল কেটে কুমির ডাকা) এই ব্যবহার তাঁর চাতুর্যকেই প্রকাশ করে।

'জাতীয় সংকট' কবিতায় তাঁর কাছে গ্রাম বা শহর এক হয়ে গেছে। যুদ্ধের ভয়াবহতা কাউকেই ছেড়ে দেয় নি।

গোধূলির পরে
পুরোনো গ্রামের পরিচিত দোকানে আসি,
টিমটিমে আলো, দেয়ালে দেয়ালে করুণ ছায়া,
শূন্য চালের থলি, শীর্ণ ইঁদুর।
.....
মনে পড়ে, কাছের শহরে অগনন লোক,

চালের কাঙাল।
আজ তাম্রসীতা, উলঙ্গিনী, দুর্ভিক্ষ বন্যা আমাদের দেশ
কিম্ভূত কিমাকার জীবে আচ্ছন্ন নিঃসঙ্গতায়
অস্থিচর্মসার সন্তানের ভিড়ে নীরবে বসে।

এই কবিতারই অন্য জায়গায় বলছেন —

তোমার দুর্দান্ত আমলে
নরহন্তা বিদেশি রাজ, রক্তজোঁক স্বদেশি বণিক, সর্পিল
পঞ্চম বাহিনী
জীবন সংকীর্ণ করে, শহরে বন্দরে, গ্রামে
প্রাচীন সভ্যতা থোঁকে ঘেন্নো কুকুরের মতো।

যুদ্ধের মর্মান্তিক ভীষণতার কাছে শহর, বন্দর বা গ্রাম কারোরই রেহাই নেই কবি সমর সেন তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

এই কাব্যগ্রন্থের কোথাও কোথাও তিনি প্রচলিত বাক্যকে ব্যবহার করেছেন —

১. 'আমাদের দেশে তেরোপার্বনে বারোমাস সাঙ্গ হলো।'
(২২শে জুন)

২. 'ট্যাক সই সংসার' (জাতীয় সংকট)

৩. 'কূপমন্ডুকের মতো' (২২শে জুন)

৪. 'ডাকে কৃমির কাটে খান' (২২শে জুন)

বহুল প্রচলিত প্রবাদের এই ব্যবহার তাঁর বিশিষ্টতার পরিচয়ক।

কোন কোন পঙক্তি তিনি শ্লোগানের মতো প্রয়োগ করেছেন —

৫. 'জীবন ধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে,
চেতনার ছাপ জীবন ধারাকে নয়।'[২০]

৬. দুনিয়ার দুশমনের প্রতিরোধে
দুনিয়াকো কিষাণ-মজদুর মজদুর কিষাণ এক হো।[২৯]

পঙক্তির এই ব্যবহার তাঁর কমিউনিস্ট সুলভ পরিচয় ফুটিয়ে তোলে।

তাঁর আত্মোসমালোচনা' কবিতায় তিনি যে ভঙ্গীতে নিজের সমালোচনা করেছেন তাতেও তাঁর ব্যঙ্গ বঙ্কিম মনের পরিচয় ফুটে ওঠে।

একদা আমরা ছিলাম বিমর্ষ বাঁদর,
আজ আস্ফালনে মত্ত যেন বীর হনুমান।

আত্মগর্বে গর্বিত বাঙালীর এর চাইতে ভাল ছবি আর কীইবা হতে পারে।

প্রগতিশীল দলের সমালোচনা করেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে 'জাতীয় সংকট' কবিতায় —

অন্ধ বধির খঞ্জের দলে ভিড়ি,
যেখানে অন্তরঙ্গ বন্ধুরা আমার,
পেশাদার নেতা রুশভক্ত শৌখিন কবি, চিন্তিত কেরানি,

এই সমালোচনা তাঁর পক্ষেই লেখা সম্ভব যিনি তাঁর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। আর এই সচেতনতা তাঁর নাগরিক মানসিকতার ফল।।

॥ ছয় ॥

সমর সেনের পঞ্চম তথা শেষ কাব্যগ্রন্থ 'তিনপুরুষ'। এরপর তিনি আর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন নি। আরো পরিষ্কার করে বলতে কবিতা রচনাই তিনি প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এই বইটিতে মোট তেরোটি কবিতা আছে। কবিতাগুলি দুটি গুচ্ছে ভাগ করা। প্রথম গুচ্ছে আছে তিনটি কবিতা – গুচ্ছটির কোন শীর্ষনাম দেন নি। দ্বিতীয় গুচ্ছে আছে বাকি দশটি কবিতা – শীর্ষনাম 'তিনপুরুষ'। তিনপুরুষ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৪ সালে। সমর সেনের কবিতায় এই গ্রন্থনামটি ব্যবহার করা হয় নি। '১৯৪৩ - ৪৪' এই সময়সীমার কবিতাগুলি তিনপুরুষের।

তিনপুরুষে সমর সেন গদ্যছন্দের সঙ্গে প্রথাসিদ্ধ কবিতার ছন্দও ব্যবহার করেছেন। পয়ার অমিত্রাক্ষর বা যৌগিকছন্দের ব্যবহারও তিনি করেছেন। এই ব্যবহার তাঁর পক্ষে নতুন হলেও তিনি কিন্তু ব্যবহারে সফল।

এই কাব্যগ্রন্থে আরো একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে, এতদিন তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার অংশ বিশেষ ব্যবহার করে রবীন্দ্র আবহকে ছিঁড়তে চেয়েছেন কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথের নিজের শ্রেণীর কবিদের প্রতি তুলনায় তিনি নিজের সুবিধাবাদী চরিত্র দেখে আত্মধিক্কার দিয়েছেন।

সমর সেনের প্রথম দিকের কবিতায় নগর যেভাবে ছবির মত ফুটে ওঠে সেভাবে শেষের দিকের কবিতাগুলিতে ফুটে ওঠে নি তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। 'কয়েকটি কবিতা' বা 'গ্রহণ' এ আমরা দেখেছি নগর কোলকাতা নাম পরিচয় সহ কবিতায় স্থান পাচ্ছে; কখনো বা কবিতার

পাত্র-পাত্রী শহরের পরিচিত পথ পরিক্রমা করছে। 'নানা কথা'য়ও দিল্লীর ছবি কোথাও কোথাও তুলেছেন। কিন্তু খোলা চিঠি বা তিনপুরুষে তা আর দেখা যায় না। অবশ্য শহরের কথা না থাকলেও কবির নগরমনস্কতার অভাব কোথাও ঘটে নি। তাঁর রাজনীতি সচেতনতা, ব্যঙ্গপ্রবণতা অথবা আত্মসমালোচনা থেকেই তাঁর মনের অবস্থান চিনে নেওয়া যায়।

তিনপুরুষ কাব্যগ্রন্থে কিছু কিছু কবিতায় তিনি শহরের উল্লেখ করেছেন। যেমন, গ্রন্থের প্রথম গুচ্ছের দ্বিতীয় কবিতাটির নাম 'শহরে'। কবিতাটিতে শহরের কথার চাইতেও বড় হয়ে উঠেছে সকল শ্রেণীর এবং গ্রাম শহর সকল স্থানের মানুষের সার্বিক দুঃখের কথা।

মহিষবর্ণ জগদ্দল মেঘে
দিগন্ত রুধ করে বৈশাখের একদিন।
শহরের প্রান্তে
জমাট অন্ধকারে কর্দমাক্ত স্তব্ধতায়
দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল চলে আপন পথে;—

দুর্ভিক্ষের পথপরিক্রমায় গ্রাম ও রেহাই পায় না বা পায় নি-তার কথা তিনি পরের পঙক্তিগুলিতে বলেছেন।

কী অতীত, কী স্মৃতি মনে জাগে,
শূধু শূন্য মাঠ, পোড়ো বাড়ি, গ্রামের শকুন।

'জোয়ার ভাঁটা' কবিতায়ও তিনি মানুষের দুঃসময়ের কথা বলেছেন। একসময়ে জীবনের সুন্দর দিকগুলি চোখে পড়ত কিন্তু আজ আর তা পড়ে না। যখন সুন্দরের প্রকাশ ছিল সহজ তখন কবিও সুন্দরকে অনুভব

করেছেন। বর্তমানের কঠিন দিনে আর সে অনুভব মনে জাগে না।

একদা সহজ লীলায় পড়েছে দুরন্ত দানব,
আত্মস্থ রাখাল ফিরেছে আপন বাটে,
পাশে তার ধানের হরিৎ,
মনে তাঁর বর্ণছটা আদিম সূর্যের
সেদিন সন্ধ্যায়
আমরা নির্জন ঘরে এসেছে দিগন্তের গান।

আজ সে-রাখাল কালের সারথি,
ধূর্ত কঠিন। রথচক্রে নির্বান্ধব প্রান্তর।

দুর্দিন আর দুঃসময়ে সবাই তার নিজের ধর্ম ভোলে। মানুষ বাঁচার আশায় উন্মত্তের মতো ছুটে বেড়ায়। যে চাষীরা একসময় গ্রাম নগরের প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখত এখন তারাই বাঁচার পথ খুঁজে বেড়ায়।

হেমন্তের প্রবীণ বিষন্নতা
দিনান্তের মাঠে, জনহীন গ্রামে
ভিটেতে ঘুঘু ডাকে,
চাষিরা পায়ে হেঁটে গেছে দূর দেশান্তরে
প্রানের সন্ধানে নগরের প্রেতলোকে।

মানুষ বাঁচার আশায় শহরে ভিড় জমায় গ্রাম জনহীন হয়ে যায়। শহরের কথা এখানে আছে কিন্তু এই শহর প্রাণহীন— তাই 'প্রেতলোক' বলছেন। গ্রামে হয়তো মানুষ নেই— কিন্তু কবি ভাবছেন সেখানে আকাশসন্ধানী বটগাছ রয়েছে— সেটাই হয়তো তাঁর কাছে আশার কথা।

'তিনপুরুষ' অংশের 'অকাল' কবিতায়ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সাথে শহর কথাটির উল্লেখ আছে। এখানে শহরের কেরাণী-শৈশবের গ্রামের ছবিটির কথা ভাবছে, শহরকে তার 'রৌরবের নিঃস্বন' বলে মনে হয়।

বিকল অন্তরে যেন বিদেশি বাঙ্গাল
বিচ্ছিন্ন শহর প্রান্তে
দূরে দেখি মাঠে কত ধানের দুলাল,
কিষাণের চষাক্ষেত নিমক হালাল।

এই শহরে তিনি যে আগন্তুক তা বোঝা যায় 'বিদেশী বাঙ্গাল' শব্দপ্রয়োগে। তাই তিনি বিচ্ছিন্ন।

'গৃহস্থ বিলাপ' কবিতায়ও গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার কথা আছে —

আমাদের বংশে
গ্রাম ছেড়ে পিতামহ প্রথম শহরে আসেন।
রক্তে তার কিছু ছিল নদীর উদ্দাম বেগ,
সাক্ষী তার ষোড়শ সন্তান।
গুরু আছে যে গৃহত্যাগ কালে
দেবী তাঁকে স্বপ্নে করেছেন বরদান
দুধে ভাতে বাঁচিবেক তোমার সন্তান।
সুতরাং
সবুজ চশমা চোখে আবরণ ছিল,
সে সবুজ আদি ভিটের জমিজমার,
কিছু বা আপন পৌরুষের।

একসময় যারা শহরে এসেছেন গ্রাম ত্যাগ করে তাদের জীবনযুদ্ধ আজকের মতো কঠিন হয়নি। তখনো 'সন্তানের জন্ম আর সর্বনাশ' সমার্থক হয়ে ওঠে নি। ক্রমশ দিন পাল্টায় —

ভদ্রভাবে দিন গুজরাণ অসম্ভব আজ।
কোঁচার পাটে ময়লা জমে,
টেরিও থাকে না ঠিক,
মোড়শপচার ব্যঞ্জন কমে।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর বিলাসিতা টেরি ও কোঁচাতে সার্থক রূপ পেয়েছে। কিন্তু শুধু মাত্র এই বিলাসিতাই নয়, মানুষের আরো গভীরতর অভাব ক্রমে দেখা দেয়

..... কিছুদিন আগে
জ্বর থেকে উঠে অন্শক্লান্ত রুগী
পেয়েছে অন্তত: পান্তাভাত,
পাশে যার নাচে নুন,
মনোহর কাঁচালঙ্কা বঙ্কিম সবুজ।
আজ তাকে দেখি বেলা দ্বিপ্রহরে
ফ্যান খুঁজে ধোঁকে গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে
বিরাট নগরে।

দুধ ভাত নয়, পান্তা ভাত কাঁচালঙ্কাও নয়, মানুষ শহরের পথে ঘোরে ফ্যান চেয়ে— পঞ্চাশের মন্বন্তরের ছবিকে তুলে ধরে।

'সাফাই' কবিতায় তিনি কোলকাতার উল্লেখ করছেন। যুদ্ধের দুর্দিনে গ্রাম ছেড়ে তিনি শহরে ফিরছেন।

গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে যাই
কঙ্কালে ভরেছে দেশ।
এ রোদে সোনার ধান পোড়ে
মনে নীলকান্ত মেঘ শেষ।
কড়া রোদ যেন শাদা জানোয়ার
দীর্ণ করে পৃথিবী আমার।
দেবতাকে গাল দিয়ে কলকাতায় ফিরি।

কিন্তু সেখানেও ব্রিজটি জেগে আছে— যেন মরাদেশে জীবন্ত মানুষ। গলিগুলি অন্ধকার যুদ্ধের কারণে, আকাশে যুদ্ধের প্লেন> সাইরেনের শব্দ, সব মিলিয়ে রুদ্ধশ্বাস অবস্থা।

'২২শে জুন ১৯৪৪' কবিতায়ও শহরের উল্লেখ আছে।

আশ্চর্য ব্যাপার দেখি আজব শহরে
দেশবিদেশি পল্টনে দিগ্বিদিক ভরে।
....
শ্রাবণ শহরে দেখি সোনার বাঙালী
একাগ্র সন্ধানে ঘোরে, কঙ্কাল কাঙালী।

যুদ্ধের দিনের ফৌজী দাপট আর নিরন্ন শহরবাসীর দুর্দশার কথা বোঝাতে চেয়েছেন। পৃথিবী ব্যাপি যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তারই আগুনে পুড়ছে আমাদের দেশের নগর গ্রাম। 'দুকোটি ক্ষুধার অভিশাপ'এখন বাংলা দেশের ঘরে— তার কারণ যুদ্ধ—যাতে আমাদের কোন দায় নেই। অথচ অন্য দেশের চিত্র হবে অন্য রকম —

অন্যদেশে লেগেছে আগুন
কালশিটে কালোমেঘ, সূর্যাস্তের রং যেন মানুষের খুন
কিন্তু সেখানে, হে দেব, আগ্নেয় স্ফুলিঙ্গে
ধূমায়িত অরণ্যপ্রান্তরে বিদীর্ণ পাহাড়ে
গুপ্তস্তরে পলিমাটি জমে; দিগ্বিজয়ী সৈন্যদল,
দর্পহর বর্বর বাহিনীর, সহজ সকাল আনে,
সেখানে ট্যাঙ্কের শব্দ স্তব্ধ হলে
বিধ্বস্ত মাটিতে আনে ট্রাক্টরের দিন

অর্থাৎ যুদ্ধের সমূহ ক্ষতি আমাদের, কিন্তু 'ক্রন্দনে কি লাভ' তাছাড়া 'কলনি দুর্বিপাকে ক্লীবের বিলাপ'। তাই আমাদের দেশ মড়কের আগুনে আর 'অনাত্মীয় ভিড়ে নগরের রাস্তা ভরে'— গ্রাম ছেড়ে যারা শহরে আসছেন সেই উদ্বাস্তুরাই আজ নগরের অনাত্মীয়— তাদের ভিড়ে শহর আরো ভারাক্রান্ত।

নগরের উল্লেখ তিনি এই বইটিতে এই কটি পঙক্তিতেই করেছেন। কিন্তু তার নাগরিক মনের প্রতিফলন ঘটেছে অন্যভাবেও—এখন সেই আলোচনায় আসা যাক।

প্রথমেই দেখা যায় নিজের এবং শ্রেণীগত সমালোচনা তিনি নানা জায়গায় করছেন। যেমন 'অকাল' কবিতায় বলছেন —

বছর পঁচিশ হলো পৃথিবীতে বাসা।
কেরানি সন্তান আমি, চতুর মানুষ,
কৈশোরে শুনেছি নানা মজাদার কথা,
কেরামৎ। এরি মধ্যে করতলগত
কত ছলা।

এখানে কেরানির সন্তান বলে একটা শ্রেণীকে এবং সেই শ্রেণীর সুবিধাবাদী চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর কেরাণী শব্দটিও লক্ষণীয়।

'বাবু বৃত্তান্ত' কবিতায়ও তিনি এই শ্রেণীর প্রতি বিদ্রূপ করেছেন —

গণশক্তি গণযুদ্ধ প্রলাপ বচন
ওসবে দেবে না কান হিন্দুর নন্দন।
পীতশক্তি অনিবার্য, শাস্ত্রের বচন।

অথবা,

আর্যনাসা বারবার কেটে অনার্যের
যাত্রাভঙ্গে সিংহহস্ত হে ধূর্ত নায়ক।
ক্ষান্ত কর ছলাকলা !

এই পঙক্তিতে শুধু আর্য জাতি সুলভ হাস্যকর মানসিকতাকেই ব্যঙ্গ করেননিসঙ্গে সঙ্গে প্রবচনের অদ্ভুত ব্যবহারেও তাঁর নাগরিক মানসিকতা ফুটে ওঠে।

'বিকলন' কবিতাতেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি ব্যাঙ্গাত্মক আক্রমণ আছে —

..... সে কি জানে
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙালী
দিনগত পাপক্ষয়ে মূঢ় ভ্রান্তমতি
লোকায়ত কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন বিধুর
মধ্যবিত্ত মানসের বিড়ম্বিত গ্লানি ?

অবশ্য এখানে ব্যঙ্গের সঙ্গে কারুণ্যের সুপ্ত মিশ্রণও ঘটেছে।

এই কাব্যগ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথের সাথে নিজেদের তুলনা করেছেন এবং এই তুলনায় নিজেদের দ্বিমুখী চরিত্র লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছেন। 'সাফাই' কবিতায় —

আমি রোমান্টিক কবি নই, মার্কিসস্ট।
অনেকে জিজ্ঞাসা করে, গুরুদেবের দৃষ্টির সঙ্গে
তোমার তফাৎটা কী ? তফাৎটা এই :
বেদ উপনিষদের বুলি মুখে তিনি বরাবর,
অক্লান্ত বাউল, একই নৌকায়
একঘেয়ে খেয়া পারাপার করেছেন,
কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ আমি
দুনৌকায় সুছেন্দে পা দিয়ে চলি,
বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর
ভাগ্যবান এ কবিকে বিপুলা যশোদা
নিশ্চয় দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আরো একটি কবিতায় '২২শে জুন ১৯৪১' এও তিনি এই রকমই তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন —

শ্রেতলোকে যারা আনে প্রাণের স্বাক্ষর,
কর্ম আর চিন্তা যাদের জীবনে হরিহর,
অমর নমস্য তারা।
....

লেনিন, স্টালিন, জুখভ ও গোর্কি,
তাদের আমরা চিনি। কিন্তু বুঝিনা তাকে,
দুধ ও তামাক সমান আগ্রহ যার
দুনৌকার যাত্রী, এই বাঙালী কবিকে,
বুঝি না নিজেকে।

দু নৌকায় পা দিয়ে সুবিধাবাদীর মত জীবন চালানোকে তিনি বরাবরই ঘৃণা করেছেন তাই সমালোচনাও করেছেন। তাঁর এই সমালোচনা শিক্ষিত নাগরিক মানসিকতারই ফল। এই মানসিকতার জোরেই তিনি বুঝেছিলেন যারা মুখে মার্কস লেনিনের বাণী আওড়ায় সেই সব মানুষের ব্যক্তি-গত সততা বলে কিছু নেই। শুধু তাই নয় তারা শ্রেণী সচেতনও নয়।

সমর সেনের কবিতায় দুঃখ বা হতাশার ছবিই বেশী ফুটে ওঠে। তিনি যুদ্ধ, মন্বন্তর শোষণ এবং নিরন্ন মানুষের হাহাকারে আশাহত হয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাপটে ইংরেজ শাসিত কলোনীগুলির যে রূপ তিনি দেখেছেন তাতে আশাহত হয়েছেন। এই যুদ্ধ আমাদের কিছু দেয় নি একটা দুঃখের ভারী বোঝা ছাড়া তাই কবি কখনো ক্ষিপ্ত হয়েছেন কখনো বা ব্যঙ্গ করেছেন। তবু কোন দুর্লভ সময়ে তিনি আশাও রেখেছেন এক সুন্দর সকালের।

আশা রাখি একদিন একান্তার পার হয়ে পাব
লোকের বসতি, হরিৎ প্রান্তরে শ্যামবর্ণ মানুষের
গ্রাম্যগানে গোধূলিতে মেঠো পথ ভরে,
পরিচ্ছন্ন খোশগল্পে মুখরিত ঘনিষ্ঠ নগর,
বাংলার লোহিত সকালে সকলের অক্লান্ত সফর।২২

সমর সেন মাত্র পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে তাঁর কবি জীবন শেষ করেন। অথচ এরপর দীর্ঘ সময় ধরে তিনি লেখার জগতেই থেকেছেন। কিন্তু কবিতায় তাঁর বক্তব্য বলা যেন এখানেই সমাপ্ত হয়েছে। তাঁর নিজের কবিতা বা সেই সময়কার কবিতা বিষয়েও তিনি প্রায় নীরব থাকার চেষ্টা করেছেন। কবিতা লেখা যখন তিনি ছেড়েছেন তখনো তিনি জনপ্রিয় কবিই ছিলেন। একথাও ঠিক নয় যে তিনি কবিতা আর লিখতে পারছিলেন না— কারণ অনুবাদ কবিতা এবং দু একটি মৌলিক কবিতার ও সন্ধান মেলে। তাহলে কবিতা লিখতে না পারার জন্য নয় কিন্তু কারণটি সমর সেন ব্যক্ত করেন নি। হয়তো তখনকার কালের কবিদের সমর সেনের অন্ধ অক্ষম অনুকরণ নিজের বক্তব্য বিষয়ে পৌনপুনিকতা ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁকে কবিতার প্রতি বিমুখ করে তুলেছিল।

বাস্তবতার বোধ, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁর বিশ্বাস, সমালোচনা, সর্বোপরি তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনা সবই তিনি কবিতার মধ্যে বলেছেন কিন্তু তাঁর বিষয়ে আমাদের যেটি বলার কথা এবং সম্ভবত: যেটি সমর সেন প্রসঙ্গে অন্যতম কথা তা হলো তিনি একান্তই নাগরিক কবি এবং তা প্রথমাবধি। প্রথম জীবনে কোলকাতার নাগরিক জীবনে যে ধূসরতা, বিবর্ণতা বা ক্লান্তিকে দেখেছিলেন পরবর্তী জীবনে সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ হিসাবে বিপ্লবী পন্থার ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। বলাই বাহুল্য তাঁর সেই আস্থা শেষ পর্যন্ত টেঁকে নি, তাহলেও তিনি নগর জীবন থেকে সরে আসেন নি। পল্লী প্রকৃতির কল্পলোকের মধ্যে বাসা বাঁধেন নি। (তাঁর মত বুদ্ধিজীবীর পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না।) এই জীবনকে তাঁর নিয়তি বলে মেনে নিয়েই সুন্দর এক সকালের স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করেছেন॥

:: সূত্র নির্দেশ ::

১. An Acre of Green Grass : Buddhadeb Bose / A review of Modern Bengali Literature : 1948.
অনুষ্টুপ সমর সেন বিশেষ সংখ্যা।

২. A modern Poet, But not progressive : Dhurjati Mukherjee
কয়েকটি কবিতা : অনুষ্টুপ সংস্করণ।

৩. নবযৌবনের কবিতা : বুদ্ধদেব বসু, কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৪ সংখ্যা।

৪. বিস্মৃতি : কয়েকটি কবিতা।

৫. একটি নিউরিটিক কবিতা : ঐ।

৬. একটি প্রেমের কবিতা : ঐ।

৭. প্রেম : ঐ।

৮. একটি মেয়ে : ঐ।

৯. বিষ্ণু দে : কয়েকটি কবিতা : সমর সেন। পরিচয় — ভাদ্র : ১৩৪৪ (অনুষ্টুপ : পরিশিষ্ট)

১০. A mor stands upon you : কয়েকটি কবিতা অনুষ্টুপ।

১১. মৃত্যু : ঐ

১২. পোস্ট গ্র্যাজুয়েট : ঐ

১৩. নবযৌবনের কবিতা : বুদ্ধদেব বসু, কবিতা - আষাঢ় ১৩৪৪ সংখ্যা (অনুষ্টুপ পরিশিষ্ট)।

১৪. একালের কবিতা : চল্লিশ দশক : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
বিচিত্রা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫।

১৫. গ্রহণ : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় চতুরঙ্গ, চৈত্র ১৩৪৬
অনুষ্টুপ : সমর সেন বিশেষ সংখ্যা।

১৬. In Defence of the 'Decadents' : Samar Sen
New Indian Literature, 1939

অনুষ্টুপ : সমর সেন বিশেষ সংখ্যা।

১৭. রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য : ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৪৭ (অনুষ্টুপ সমর সেন বিশেষ সংখ্যা)।

১৮. নানা কথা : মনীন্দ্র রায় কবিতা : আশ্বিন ১৩৪১।

১৯. নানা কথা : ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচয় : ফাল্গুন ১৩৪১।

২০. জাতীয় সংকট : খোলা চিঠি

২১. খোলা চিঠি ঐ

২২. ২২শে জুন ১৯৪৪ : তিনপুরুষ।

****